দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ১ নভেম্বর, ২০২১।। ১৪ কার্তিক- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

।। দীপাবলী বিশেষ সংখ্যা।।

৭৪ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১৪ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১ নভেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

আক্রমণ এপারে-ওপারে, সাধু সাবধান!

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

পিসিই প্রধানমন্ত্রী ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

বাংলাদেশি মুসলমানের পাকিস্তানি চরিত্র এখনও বদলাল না

◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৮

বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় জিহাদি তাণ্ডব

◻ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ ◻ ১১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি বিকার এবং রাজেশ-তাপসের স্বপ্ন

◻ স্নেহাংশু মজুমদার ◻ ১৩

এক যুবতীকে জিপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল তালিবান জঙ্গিরা

◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ১৬

সুদীনকুমারের পুজোর বাক্সে থাকত পঞ্চমুণ্ডির সিদ্ধাসন

◻ হীরক কর ◻ ১৯

সৃষ্টির দেবী কালিকা ন্যায়েরও দেবী ◻ সুজিত রায় ◻ ২৩

মহাকালকে কলন করেন বলে তিনি কালী

◻ গোপাল চক্রবর্তী ◻ ২৫

শক্তি সাধনার ভূমি এই বঙ্গদেশ ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ২৭

ভগিনী নিবেদিতার মননে কালী ◻ স্বপ্না কুণ্ডু ◻ ২৯

মেয়ের নাম করুণা, মায়ের নাম করুণাময়ী

◻ অনামিকা দে ◻ ৩১

ভাই-বোনের পবিত্র স্নেহের পরশ—ভাইফোঁটা

◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ৩৩

সংকট নিরসনে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যাশা ভারতই পূরণ করতে পারে : মোহনরাও ভাগবত ◻ ৩৫

বৈদিক যুগে নারীজাতির অবস্থান ◻ পুনম নেগী ◻ ৪৩

এক সাহসী সেবাময়ী নারী শ্রীমতী মুনমুন সরকার

◻ বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৪৬

প্রচারবিমুখ এক সমাজসেবী ◻ ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ ◻ ৪৯

ফঃ ১

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street
4th Foor
Kolkata - 700 069
Phone : Nos. 22483203
Fax No. 22483195
Email : eita.cal@eitain.com

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A
Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

হিন্দু বলবান হউক

দেবী কালিকার পূজার সহিত বঙ্গজীবনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যে মূর্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা কোন মন্ত্রবলে বাঙ্গালির মনে চিরস্থায়ী জায়গা করিয়া লইল, তাহা বিস্ময়কর বটে। ইহার প্রাথমিক কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয়, কালীমায়ের তিন সাধক রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ ও বামাখ্যাপা বঙ্গভূমির তিন ভৌগোলিক স্থান যথাক্রমে হালিশহর, দক্ষিণেশ্বর ও তারাপীঠে অবস্থান করিয়া কালী সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালি-মানসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বাঙ্গালির সহিত এই দেবীর আত্মিক সম্পর্ক এতটাই সুগভীর যে, তাহা শুধুমাত্র এই তিন সাধনক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। আজ বঙ্গের স্থানে স্থানে কালীমায়ের সাধনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, যাহার প্রসিদ্ধি লাভে প্রমাণিত হয় বঙ্গভূমিতে এই দেবীর জনপ্রিয়তা। শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, স্বস্তিকা পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মাতৃসাধক ভবেন্দু ভট্টাচার্য কালীমাতৃকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তবে বাঙ্গালি দেবী কালিকার অন্য রূপ দেখিয়াছিল স্বদেশী আন্দোলনের কালপর্বে। বিপ্লবীগণ কালীমায়ের পূজা করিয়া ব্রিটিশ-বধে বাহির হইত, ইহা উত্তরকালেও বাঙ্গালির শিরায় শিরায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবাহিত করিয়া দেয়। সেকালে দরিদ্রের মিত্রসম পরোপকারী খ্যাতকীর্তি রঘু ডাকাত, বিশে ডাকাত প্রমুখের মা কালীর পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যাইবার প্রচলিত কিংবদন্তী কোথাও যেন দেবীর আরাধনাকে বীরত্বব্যঞ্জক করিয়াছে। তবে মাতৃমূর্তির রূপের ভিন্নতর আঙ্গিক দেখাইয়াছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে—আজও যাহার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। যাহাতে দেবী কালিকা মুসলমান ও ব্রিটিশ শাসনাধীনে দেশের অবস্থার প্রতিফলন করিতেছেন, তিনি হৃতসর্বস্বা, তাই বিবস্ত্রা ও মুণ্ডমালিনী বিভূষিতা। স্বদেশী যুগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় দেশমাতৃকার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশবাসীকে ক্ষাত্রতেজে জাগরিত করিবার নিমিত্তে লেখা হইয়াছিল :

'না হইতে মাগো বোধন তোমার ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট।/জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট।।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইবো গলে, বিনাশ করিবো অসুরের দলে,/রক্তস্মৃধি আজ করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।।'

যাহাকে এখন 'ভারতীয় উপমহাদেশ' নামে অভিহিত করা হয়, সেই বিশাল ভূখণ্ড একদা ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত ছিল। ইহারই এক কোণে অবস্থিত পূর্ববঙ্গ এখন যাহা 'বাংলাদেশ' নামক পৃথক দেশ হইয়াছে, সেইখানে হিন্দুরা আজ বিপন্ন। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন হইয়াছে। কুমিল্লার নানুয়া দিঘির পাড়ে একটি পূজামণ্ডপে হিন্দুদিগের হেনস্থার উদ্দেশ্যে কোরান রাখিয়া আসাকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দুদের উপর নারকীয় তাণ্ডব হইয়াছে। ধর্ষণ, বলাৎকার, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করিয়া নৃশংস হত্যা; অত্যাচারের অন্তিমসীমা অতিক্রম করিয়াছে। ধর্ষণের ফলে চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে দশ বছরের বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। এই ভয়ংকর অত্যাচারে কত পুরোহিতের জীবন গিয়াছে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। চৌমুহনিতে রামঠাকুরের আশ্রমের তিন পুরোহিত, রামু সর্বজনীন মন্দিরের একজন, নিমাইকৃষ্ণ-সহ নোয়াখালির ইসকন মন্দিরের দুই সাধু, সেখানকার পূজামণ্ডপের যতন সাহা নামের এক পুরোহিত—নামের তালিকা ক্রমশ দীর্ঘ হইবে। এমনকী ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা অবশ্য প্রতিরোধ করা হইয়াছে। এইবার কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতি বছরই পূজার সময়ে হিন্দুদের উপর হামলা সেই দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সরকারি মদত না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না। আজ চাপে পড়িয়া বাংলাদেশ সরকার সে দেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি ফিরাইয়া আনিবার কথা বলিলেও মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট দেশে তাহা কার্যে পরিণত করা যে তামাশা মাত্র, তাহা বিপন্ন হিন্দুমাত্রই অনুভব করিবেন। তাই অতীত হইতে শিক্ষা লইয়া নিজের নিরাপত্তা বাংলাদেশের হিন্দুদের নিজেদেরই সুনিশ্চিত করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সর্বতোভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়াইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যদি মনে করেন, নৌকার একদিক ফুটো হইয়াছে, আমরা তো আরেকদিকে দাঁড়াইয়া সুখে কাল যপন করিবো; তাহা হইলে '৪৬-এর ভয়াবহতা যে খুব শীঘ্রই দৃশ্যমান হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়া দেবী কালীকার পূজা সমাপনান্তে হিন্দু ক্ষাত্রবীর্যে বলীয়ান হইয়া নিজেকে ও দুর্বলকে রক্ষায় অগ্রসর হউক—ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

সুভাষিতম্

আপৎসু মিত্রং জানীয়াদ্ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্যা ক্ষীণেষু বিত্তেষু ব্যসনেষু চ বান্ধবান্।। (হিতোপদেশ)

বিপদের সময় বন্ধু, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের, ঋণগ্রস্ততার সময় শুদ্ধতা, ধনহীনতার সময় পত্নীর এবং সংকটের সময় বন্ধু-বান্ধবদের চেনা যায়।

আক্রমণ এপারে-ওপারে সাধু সাবধান!

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের 'হিন্দু নিধন' যজ্ঞের 'মাস্টার মাইন্ড' বা 'কারিগর' এক মাদকাসক্ত পাগল। দাবিটা হাস্যকর। একজন শিশুও জানে 'হিন্দু হত্যা' কাদের মদতে ঘটেছে। হাসিনা সরকার সেই সাপের গর্তে সহজে হাত দেবেন বলে মনে হয় না।

তবে এটা প্রমাণিত যে পাগল লেলিয়ে হাসিনাকে নাজেহাল করার মতো শক্তি বাংলাদেশে রয়েছে। বিনা দোষে পাগলামির খেসারত দিয়েছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা। ১২ অক্টোবর থেকে ১৩ জেলায় তাদের উপর চলেছে তাণ্ডব, হত্যা আর ধ্বংসলীলা। সারা বিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। নির্বাচনোত্তর পশ্চিমবঙ্গেও আগ্রাসন হয়েছে। রাজ্য সরকার তা মানতে নারাজ তাই আদালতের নির্দেশে তার তদন্ত চলছে।

দুয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। ভোট রাজনীতি মাথায় রেখে কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন নেতা দুয়ের সমান্তরাল টানতে চেয়ে নিন্দাভাজন হয়েছেন। বাংলাদেশে 'হিন্দু হত্যা'-র নিন্দা করে সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল প্রতিনিধিরাও প্রায় বাধ্য হয়ে সে দলে নাম লিখিয়েছেন। এরকম পরিস্থিতিতে সচরাচর তারা তা করেন না।

খুবই আশ্চর্য যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সদর কার্যালয় বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনও প্রতিবাদ বা নিন্দা জানানো হয়নি। যদিও বাংলাদেশে মিশনের সন্ন্যাসীরা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তবে তৃণমূল অযাচিত আর মস্তিষ্কহীন ভাবে বিজেপিকে দলীয় মুখপত্রে শকুনি বলেছে। তার সঙ্গে বাংলাদেশের ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই। তাদের 'বলিয়ে-কইয়ে' সর্বজ্ঞানী সুপ্রিমো

> **ভারতে ও বাংলাদেশে তালিবানি ধরনের উত্থান ও নৈরাজ্য রুখতে হবে 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর হাত ধরে আর 'হিন্দু জাগরণ'-এর মধ্যে দিয়ে। কারণ 'আগ্রাসন আমাদের এপারে ওপারে। ভিতরে বাইরে।**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য একটি 'রা'-ও কাটেননি। যেমন শাহরুখ পুত্র আরিয়ানের মাদক যোগ নিয়ে তিনি চোখ উলটে রেখেছেন। শাহরুখ রাজ্যের 'পণ্যচিহ্ন'। সর্বোপরি তিনি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ।

স্বাধীনতার পর থেকে বাম আর কংগ্রেস নেতাদের দয়ায় এই গোষ্ঠী আর সংখ্যালঘু নয়। তারা দেশের 'দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ' সম্প্রদায়। এই মান্যতা তারা পেয়ে গিয়েছেন। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১২৪টি আসন সরাসরি এই সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণে। ফলে ক্ষমতা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক ছলচাতুরীতে অত্যন্ত পটু রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে 'ভোট-জুয়া' খেলবেন না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কয়েকজন তৃণমূল নেতা আড়ালে আবডালে স্বীকার করছেন যে বাংলাদেশের ঘটনার প্রভাব ৩০ অক্টোবর শান্তিপুর ভোটে পড়বে।

২০১১ সালে এই সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়ে সিপিএম আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা রাজ্য থেকে বিদায় নেয়। এখন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহর পুত্র জয় শাহর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে মমতা সোচ্চার হন কিন্তু শাহরুখ নিয়ে তিনি 'স্পিক-টি-নট'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন এক সর্বভারতীয় অভিনেতা আমাকে একবার বলেছিলেন 'যতদিন শাহরুখ, আমির, সলমনরা আছেন মমতার পশ্চিমবঙ্গে আমাদের 'নো এন্ট্রি'। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাদেশ নিয়ে কিছু বলেননি। মমতার মতো তাঁর সঙ্গেও হাসিনার সখ্য রয়েছে। তাই হাসিনাতে আস্থা রেখে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিকারের দায়িত্ব তার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ইন্দিরা গান্ধীর উদাহরণ টানছেন। দুটি পরিস্থিতি আলাদা। তাই তুলনা চলে না। বাংলাদেশের ঘটনায় অশনি সংকেত দেখেছে আমেরিকা আর রাষ্ট্রসঙ্ঘ। বাংলাদেশের আগ্রাসন ধর্ম ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক। এর ফল সুদূরপ্রসারী আর মারাত্মক। ভারতে সম্প্রীতির বার্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত বহুদিন আগেই দিয়ে রেখেছেন। তিনি জানিয়েছিলেন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানুষের ডিএনএ আলাদা নয়। উভয়ে ভারতের মানুষ। ধর্ম বিচার করে তাদের আলাদা করা অনুচিত। বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর জিহাদি আঘাত হয়েছে। সাংবিধানিক পথেই তার সমাধান করতে হবে। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে দায়িত্বশীল হিন্দুদেরই সে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

অবিবেচকের মতো পালটা প্রত্যাঘাত বা বদলার চড়া সুর বরদাস্ত করা উচিত হবে না। তাতে হিংসা বাড়বে। ঘাত প্রতিঘাত থামবে না। হিংসা হিংসাকেই মদত দেয়। সাময়িক জয় পরাজয় কেবল ক্ষণিকের আয়ু। ভারতে ও বাংলাদেশে তালিবানি ধরনের উত্থান ও নৈরাজ্য রুখতে হবে 'একাত্ম মানবদর্শন'-এর হাত ধরে আর 'হিন্দু জাগরণ'-এর মধ্যে দিয়ে। কারণ 'আগ্রাসন আমাদের এপারে ওপারে। ভিতরে বাইরে। তাই সাধু সাবধান।'

পিসিই প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন, কলকাতা

রবি ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বীরভূমে। আর কলকাতায় শান্তিনিকেতন মানে আপনার প্রাসাদ। তার ঠিকানা লাগে না। এতেই চিঠি পৌঁছে যাবে মাননীয় অভিষেকবাবু আপনার কাছে। আপনি হচ্ছেন গিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মুকুল রায় দল ছাড়ার পরে এই পোস্ট ফাঁকা রাখা হয়েছিল। আপনি দখল পেয়েছেন সবেই। আর তার পর থেকেই দলকে সর্বভারতীয় করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তা ভালো। দিদিকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে হবে। আপনিও তো পিসিকে দিদি বলেই ডাকেন শুনেছি। দিল্লি পাঠাতেই হবে দিদিকে। তবেই না এ রাজ্যের তখত আপনার জন্য নিশ্চিত হবে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় পশ্চিমবঙ্গে সব আসনেই আপনারা জিতবেন তবেও তো সরকার গড়া যাবে না। ৫৪২ আসনের লোকসভায় ৪২ সংখ্যাটা বড়োই ছোটো। আর বারবার জোট গড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করা আপনার পিসিকে তো অন্য দলের নেতারা কেউ বিশ্বাসই করে না। হতে পারে আঞ্চলিক দলগুলির মধ্যে এক নম্বরে রইল তৃণমূল। কিন্তু তাতেও কি দিদির কপালে শিকে ছিঁড়বে? তবে এটা ঠিক যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা বঢ়রাদের যা হাল তাতে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার মতো কোনও মুখই নেই দেশে। আপনি অবশ্য মনে করেন দিদি সেই মুখ হতে পারে। শুধু তাই নয়, আপনার দিবাস্বপ্নে আপনার দল নাকি খুব শীঘ্রই ত্রিপুরা, গোয়া, মিজোরাম ও উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় আসতে চলেছে। আপনি যখন এই কথাগুলো বলেন তখন একবার ভিক্টোরিয়ার সামনে গেলে দেখা যাবে ঘোড়াগুলো খ্যা খ্যা করে হাসছে।

আপনি তখন বেশ ছোটো। ১৯৯৭ সালে কংগ্রেসের 'প্লেনারি সেশন' বলেছিল কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। তখন কংগ্রেস সভাপতি সীতারাম কেশরী। 'বিক্ষুব্ধ' নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই অধিবেশনে যোগ দেননি। তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে 'আউটডোর' সমাবেশ করেন। পর্যায়ক্রমে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করে কংগ্রেস। দিদি ১৯৯৮ সালের ১ জানুয়ারি তৃণমূল গঠন করেন। তারপর তেইশটি বছর কেটে গিয়েছে। এটা ঠিক যে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে মমতা পশ্চিমবঙ্গে নিজেই 'আসল কংগ্রেস' হয়ে উঠেছেন। বস্তুত, কংগ্রেস ছেড়ে মমতার মতো এমন বিপুল সাফল্য অতীতে আর কোনও নেতা পাননি। প্রণব মুখোপাধ্যায়, শরদ পাওয়ার, পূর্ণ সাংমা, জিকে মুপনারের মতো নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে নিজের নিজের রাজ্যে দল গড়েছিলেন। কেউই সাফল্য পাননি। কেউ কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। কেউ কেউ কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা বা জোটে গিয়েছেন। কিন্তু মমতা পশ্চিমবঙ্গে কার্যত পুরো কংগ্রেসকেই নিজের দলে টেনে নিয়েছেন। সঙ্গে টেনে নিয়েছেন কংগ্রেসের ভোটও। সে অর্থে কংগ্রেস-ত্যাগী নেতাদের মধ্যে মমতার সাফল্য নজিরবিহীন। এখন তো বামেদের মতো কংগ্রেসও শূন্য।

গত কয়েকমাসে ত্রিপুরায় তৃণমূলের উপস্থিতি অনেকাংশে বেড়েছে। মানে কলকাতা থেকে যাওয়া নেতাদের উপস্থিতি। শোনা যাচ্ছে মুকুল রায়, সব্যসাচী দত্তদের তৃণমূলে ফেরানোর পিছনে এমন শর্তই রয়েছে যে তাঁরা ত্রিপুরায় সংগঠন বাড়াতে অর্থ বিনিয়োগ করবেন। আবার সন্তোষমোহন দেবের কন্যা সুস্মিতাকে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে এই চুক্তিতে যে, ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখল না হলে পদ থাকবে না। এটা অভিষেকবাবু, আপনি মানবেন না আমি জানি। কিন্তু যেই সময়ে সুস্মিতা দেবের সাংসদ পদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে তার হিসেবেই রয়েছে সেই চুক্তির ইঙ্গিত।

আপনার দলের মানচিত্রে এর পরেই রয়েছে গোয়া। সেখানে আগামী ফেব্রুয়ারিতেই বিধানসভা ভোট। তৃণমূল সেখানে লড়তে তৈরি হচ্ছে। অভিষেকবাবু আপনি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পরেই বলেছিলেন, দলকে বাঙ্গলার বাইরেও শক্তিশালী করতে চান। গোসাবায় উপ-নির্বাচনের প্রচারে গিয়েও আপনি বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশীর্বাদ করেছেন। রাজ্যে বিজেপি বিতাড়নের কাজ সম্পূর্ণ। যেখানে যেখানে বিজেপির অত্যাচার লাগামছাড়া, সেখানে পৌঁছবে তৃণমূল'।

অভিষেকবাবু, আপনাদের দলের নামের আগে 'সর্বভারতীয়' (অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস) শব্দটি থাকলেও নির্বাচন কমিশনের খাতায় কিন্তু সেই 'স্বীকৃতি' নেই। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দলকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি পেতে হলে তিনটি শর্তের যে কোনও একটি পূরণ করতে হয়। এক, দেশের কমপক্ষে তিনটি রাজ্য থেকে লোকসভার ২ শতাংশ আসনে জয়। দুই, কমপক্ষে চারটি রাজ্যে লোকসভা ভোটে ৬ শতাংশ ভোট এবং চারটি বা তার বেশি আসনে জয়। তিন, কমপক্ষে চারটি রাজ্যে সেই রাজ্যের দল হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হবে। এখনও পর্যন্ত ওই তিন শর্তের কোনওটিই পূর্ণ হয়নি তৃণমূলের। যদিও আপনি স্বপ্নের পোলাওয়ে যথেচ্ছ পরিমাণে ঘি ঢেলে বলেছেন, 'দেড় বছরের মধ্যে ত্রিপুরায় তৃণমূল সরকার তৈরি করবে। শুরু হয়েছে গোয়া অভিযান। চারমাসের মধ্যে সেখানেও হবে সরকার। এর পর মেঘালয় এবং উত্তরপ্রদেশ।'

বাংলাদেশি মুসলমানের পাকিস্তানি চরিত্র এখনও বদলাল না

মণীন্দ্রনাথ সাহা

শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দু বাঙ্গালির শ্রেষ্ঠ পূজা। ভারত, বাংলাদেশ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত হিন্দু বাঙ্গালিরা তাদের প্রিয় ও বড়ো নিষ্ঠাভরে পালন করে থাকেন। সেক্ষেত্রে অন্য সমাজের বা ধর্মের লোকেরা সেই পূজার বিরোধিতা করেন না। কিন্তু বাংলাদেশে এবারে দুর্গাপূজায় যেভাবে লাগাতার দুর্গামণ্ডপ ভাঙচুর, মূর্তি ভাঙচুর, হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলেছে, তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোনো বাংলা খবরের চ্যানেলে প্রাইম শো তো দূরের কথা হেডলাইন পর্যন্ত দেখা যায়নি। অথচ ইজরায়েল যদি সেদেশে সন্ত্রাসবাদীদের ওপর বম্বিং করে তাহলে সেটার জন্য এক সপ্তাহ ধরে প্রাইম শো চলে। সকলের মনে রাখা উচিত, কয়েকদিন আগেই আফগানিস্তান থেকে শেষ হিন্দু ও শিখদের চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। এবার বাংলাদেশের পালা।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে কোনো ছুঁতোনাতা নিয়ে যে নির্মম অত্যাচার চলছে তার নজির বর্তমান বিশ্বের আর কোথাও নেই। কখনো ফেসবুকে হিন্দুর নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে নবিকে অপমানের অজুহাতে, কখনো ইসলাম অবমাননার অজুহাতে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেওয়া, নারী নির্যাতন, পুরুষদের মারধর করার দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমে দেখা গেছে। বারে বারে আশাভঙ্গ হলেও বিশ্বাস ছিল, কালক্রমে বাংলাদেশি মুসলমানরা তাদের পাকিস্তানি চরিত্র সংশোধন করে নেবে। ১৯৪৬-৪৭, ১৯৫০-৫১, ১৯৬২-৬৪ সালে যে বর্বরতার পরিচয় তারা দিয়েছিল, আশা ছিল ১৯৭১ সালের রক্তস্রোত তাদের চরিত্রের অন্তত কিছু পরিমাণ হলেও ধুয়ে-মুছে দেবে। কিন্তু বৃথা আশা। 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুচ্যতে'— কয়লার ময়লা ঘোচে না শতবার ধুলেও। বাংলাদেশি মুসলমানদের কিছু অংশ পশুত্বের কোন্ স্তরে নেমেছে তাঁর পরিচয় তারা যেমন ১৯৯৩, ২০০১ এবং তৎপরবর্তীতে দিয়েছে, তেমনি এখনও তা দিয়েই চলেছে।

বাংলাদেশে হিন্দু মঠ-মন্দির, দেব-দেবী মূর্তি ভাঙা, ছলচাতুরী করে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ, নারী নির্যাতন, এখন যেন নিত্যনৈমিত্তিক জলভাতে পরিণত হয়েছে। কয়েকদিন আগে কুমিল্লা শহরে একটি পূজামণ্ডপে মূর্তির পায়ের উপরে কোরান উদ্ধার হওয়ার পর সেখানে কতকগুলি পূজামণ্ডপে ভাঙচুর চালানো, দেবীমূর্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বে তার প্রতিবাদ হয়েছে। মণ্ডপের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, জনৈক বাংলাদেশি এক মুসলমান পুলিশ মূর্তির পায়ের উপর কোরান রাখছে। হিন্দুরা পবিত্র কোরানের অবমাননা করেছে এই খবরে হাজারে হাজারে জেহাদি মুসলমান ঝাঁপিয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপে। শুধু কুমিল্লা শহরেই নয়, আরও কয়েকটি জেলায়ও পূজামণ্ডপে আক্রমণ করা হয়েছে। যদিও সরকার তৎপরতার সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

> **বছরের পর বছর ধরে যদি বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকে তাহলে এই পবিত্র খণ্ডিত ভারতভূমিতে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়ম— 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া' যে ঘটবে না তার প্রতিশ্রুতি কে দেবে?**

কিন্তু কোথায় গেলেন পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপ্রেমী সেইসব ধর্মনিরপেক্ষীর দল? কোন গর্তে লুকিয়েছে শিবলিঙ্গে, ত্রিশূলে কন্ডোম পরানো বিপ্লবীদের দল? আজ তারা এমন অন্ধ-কালা-বোবা সেজে গেলেন কেন? এরা নাকি বুদ্ধিজীবী! এরা নাকি শিল্পী সাহিত্যিক সংস্কৃতির সেবক? মুসলমানদের হাতে হিন্দুদের লাঞ্ছনা, হিন্দুদের আরাধ্য দেব-দেবীমূর্তি ভাঙচুর, মন্দির ভাঙচুর দেখেও এরা চুপ করে থাকেন। অথচ এদেরেই পূর্বসূরী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে অবিভক্ত বাঙ্গলায় মুসলমান গুন্ডাদের দৌরাত্ম্যে ও মুসলমান নেতাদের নীরবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি। তিনি বলেছেন— 'একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপর যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনো সংকোচ মানে নাই। দেশের রাজা হইয়াও তারা এ জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই।' কথাটা নিখাদ সত্য। ব্রিটিশ শাসনাধীনে হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের জঘন্য প্রবৃত্তির শিকার হয়েছিল, দেশভাগের পর এবং তৎপরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও হিন্দুদের উপর মুসলমানদের জঘন্য প্রবৃত্তির অবসান ঘটেনি বরং এখনও ঘটে চলেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল ও মহিলা সমিতিগুলি এমন মৌনী সেজে গেলেন কেন? সবাই কি আইএসআইয়ের কাছে মাথা মুড়িয়েছেন, খাতায় নাম লিখিয়েছেন আরবের তৈলাক্ত ডলারের আশায়?

ইতিপূর্বে সংবাদমাধ্যমের দৌলতে আমরা জেনেছি বাংলাদেশের মুসলমানদের কিছু কিছু লোক হিন্দু মেয়ে-বউদের ধর্মান্তরিত করা এবং ধর্ষণ করাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। সেখানকার হিন্দু মহাজোটের নেত্রী প্রিয়া সাহা

স্বয়ং আমেরিকায় গিয়ে আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর মুসলমানদের নির্যাতন বন্ধের জন্য। আরও দেখা গেছে সেদেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র সিন্‌হা কর্মরত থাকাকালীন তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখে সরকারি আধিকারিকদের দিয়ে মানসিক নির্যাতন ও শেষে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দিয়ে লাথি মেরে দেশ থেকে বিতাড়নের কথা। কী অপরাধ ছিল, তিনি আরও ছ'জন বিচারপতিকে (তাঁরা প্রত্যেকেই মুসলমান) নিয়ে গঠিত সাত সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ গঠন করে, সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দেওয়া এক মামলার রায় বহাল রেখেছিলেন। অথচ সেই বেঞ্চের অন্য ছ'জন বিচারপতির বিরুদ্ধে তো সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি? পদক্ষেপ নেয়নি তার কারণ তাঁরা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। আর সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হার অপরাধ ছিল তিনি হিন্দু।

দেশভাগের সময় তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৯ শতাংশ। তারপর সেই সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় নেমে এসেছিল ১৯ শতাংশে। পাকিস্তানের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য হিন্দু মুসলমান সমবেত ভাবে লড়াই করেছিলেন। শরণার্থীদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান দিয়ে যেমন তাদের প্রাণ ধারণের ব্যবস্থা করেছিল ভারত, তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে স্বাধীনতা আদায় করে দিয়েছিল। জন্ম হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে সেই লড়াইয়ে প্রায় ৩০ লক্ষ নর-নারী প্রাণ হারিয়েছেন। তার মধ্যে হিন্দুর প্রাণ গিয়েছে ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। এই বিপুল পরিমাণ হিন্দুদের খান সেনারা বেছে বেছে হত্যা করেছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখানকার হিন্দুরা মনে করেছিলেন এবারে তারা অন্তত একটু শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু তাদের সে আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। সে দেশের এক শ্রেণীর মুসলমান পরিকল্পিতভাবে ইসলামের পয়গম্বর নবিকে, পবিত্র কোরানকে হিন্দুরা অপমান করছে গুজব ছড়িয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে নির্যাতনের একটিই উদ্দেশ্য তা হলো বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে তাদের জমি ও সম্পত্তি দখল করা। যার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে হিন্দুদের জনসংখ্যা ১৯ শতাংশ থেকে কমে বর্তমানে ৮ শতাংশে নেমে আসায়। এদিক দিয়ে দেখলে তারা অবশ্যই তাদের হিন্দু বিতাড়ন পরিকল্পনায় সফল হতে শুরু করেছে। যার জন্য গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বারকাত সাহেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, আগামী ২০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু বলে কেউ থাকবে না। তিনি সঠিক কথাই বলেছেন।

তবে এটাও ঠিক সে দেশের বহু মুক্তমনা বুদ্ধিজীবী এসমস্ত নারকীয় কাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করে চলেছেন এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছেন যাতে শান্তিপ্রিয় হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত নির্যাতন বন্ধ হয়। দেখা যাচ্ছে সরকারও এ ধরনের ঘটনা ঘটার পরপরই দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, গুন্ডাদের গ্রেপ্তার করছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রতিবাদ আন্দোলন বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুলিশের গুলিতে হামলাকারীদের ৯ জন প্রাণ হারানোর খবর পাওয়া গেছে। সরকারের এই পদক্ষেপকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে। সরকারও দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য, কারণ বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে যদি সেদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চলতেই থাকে তাহলে এই পবিত্র খণ্ডিত ভারতভূমিতে বিজ্ঞানের অমোঘ নিয়ম— 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া' যে ঘটবে না তার প্রতিশ্রুতি কে দেবে? ▯

শোক সংবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ খণ্ডের বুইতা শিবাজী শাখার পালক কার্যকর্তা ফটিক নস্কর গত ২ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ৩ কন্যা-জামাতা সহ নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ প্রণবেশ করের পিতৃদেব অনিল কুমার কর গত ১ অক্টোবর মাদপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

দানবীর রায়সাহেব গঙ্গাধর নন্দের প্রপৌত্র ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তাম্রলিপ্ত জেলার পূর্বতন সভাপতি প্রয়াত পণ্ডিতপ্রবর জ্যোতির্ময় নন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র, মুগবেড়িয়া নন্দ পরিবারের প্রবীণ সদস্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী পরম-ভাগবত চিন্ময় নন্দ গত ২৮ সেপ্টেম্বর ৮০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি অধ্যাত্ম জগতের উচ্চকোটি বহু সাধকের সঙ্গলাভ করেছেন। বালক বয়সে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করেন এবং তাঁর সঙ্গে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এছাড়া, অভয়চরণ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বিজয়ানন্দজী মহারাজ, শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী, স্বামী স্বরূপানন্দজী, কাশীর ড. গোপীনাথ কবিরাজ, সাধক দিলীপকুমার রায়, ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, স্বামী আত্মস্থানন্দজী-সহ বহু সাধকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের একজন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। এছাড়া , বহু সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও পরিচালনার কাজেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

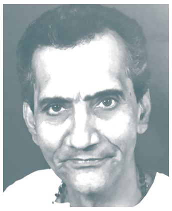

* * *

হাওড়ার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমিতাভ পালসাই গত ১১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। অধুনা ভারতীয় জনতা পার্টিতে তিনি সক্রিয় দায়িত্ব পালন করছিলেন। অত্যন্ত সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত মানুষটি নিজর বসত-পল্লীর দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের পড়াতেন, সেই সুবাদে তিনি এলাকায় মাস্টারমশাই বলে পরিচিত ছিলেন। আদর্শনিষ্ঠ, নিরহংকার এবং মাটিতে পা-থাকা নেতারূপে দলে যে-কোনোরকম বিচ্যুতি তাঁকে যথেষ্ট পীড়া দিত।

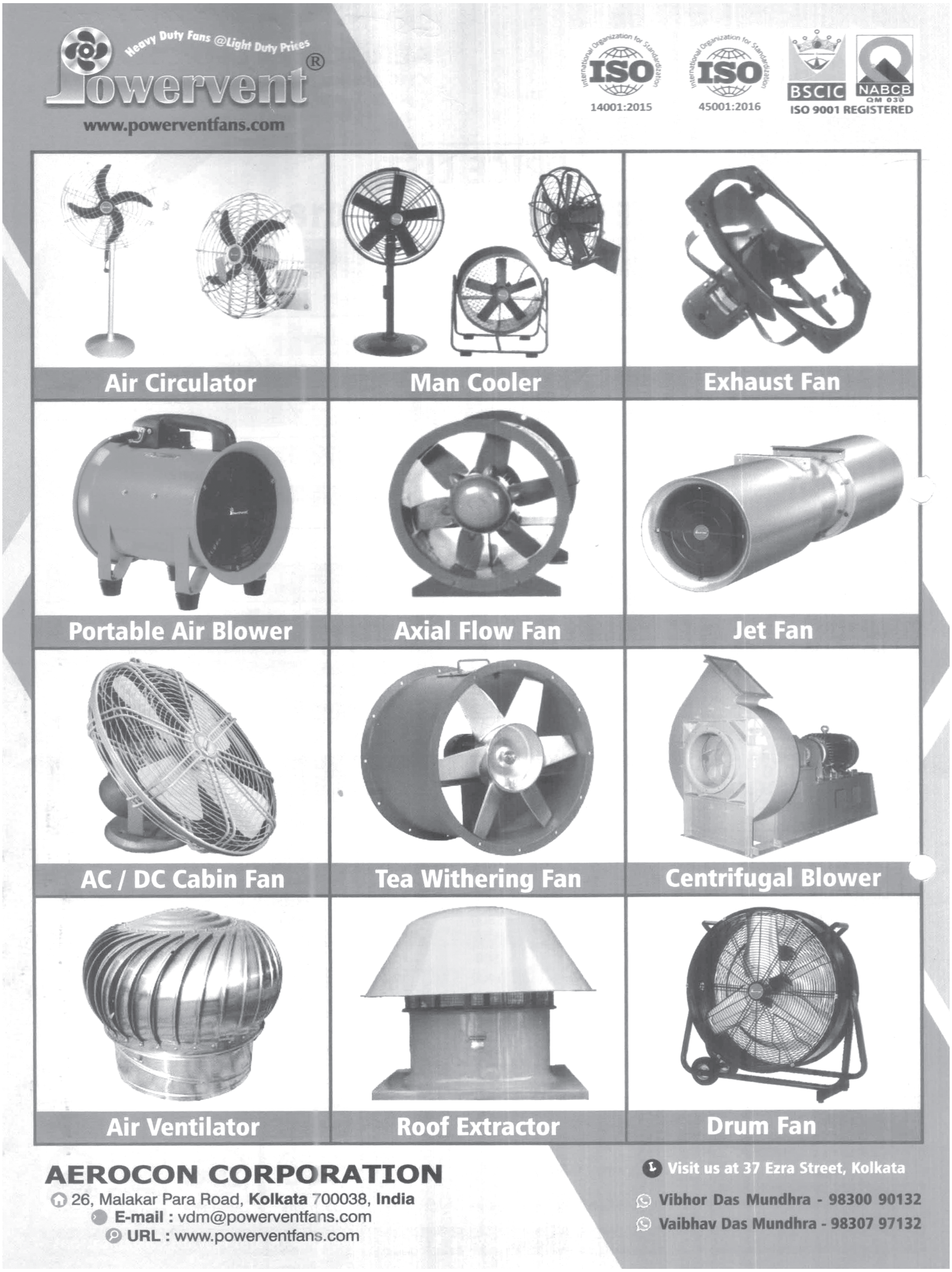
Heavy Duty Fans @Light Duty Prices
Powervent®
www.powerventfans.com
ISO
14001:2015
ISO
45001:2016
BSCIC
NABCB
ISO 9001 REGISTERED
Air Circulator
Man Cooler
Exhaust Fan
Portable Air Blower
Axial Flow Fan
Jet Fan
AC / DC Cabin Fan
Tea Withering Fan
Centrifugal Blower
Air Ventilator
Roof Extractor
Drum Fan
AEROCON CORPORATION
26, Malakar Para Road, Kolkata 700038, India
E-mail : vdm@powerventfans.com
URL : www.powerventfans.com
Visit us at 37 Ezra Street, Kolkata
Vibhor Das Mundhra - 98300 90132
Vaibhav Das Mundhra - 98307 97132

বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় জিহাদি তাণ্ডব

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজের উপরে সংখ্যাগুরু মুসলমান জনতার হামলা অব্যাহত। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘির পাড় এলাকায়, সপ্তমীর সকালে পূজামণ্ডপের একটি ছবি ঘিরে ঘটনার সূত্রপাত। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ মণ্ডপের ভিতরের একটি মূর্তির পাশে পাওয়া যায়। তারপর সেই খবর ছড়িয়ে পড়লে হামলা চালানো হয় একাধিক মণ্ডপে। অভিযোগ, হিন্দুরা ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরানের অবমাননা করেছেন। আর সেই অভিযোগ তুলে কয়েকশো মুসলমান জনতা সকালবেলা দিঘির পাড়ের দুর্গামণ্ডপে হামলা চালায়। দুর্গামূর্তি সমেত একের পর এক প্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এখানেই থেমে থাকেনি মুসলমান মৌলবাদীরা। বাংলাদেশের জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সূত্রে জানা গিয়েছে মুসলমান মৌলবাদীরা কুমিল্লা জেলার ৯টি দুর্গামণ্ডপে হামলা চালিয়েছে। বহু মণ্ডপের দুর্গামূর্তি সমেত অন্যান্য মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু স্থানে পুলিশ মোতায়েন থাকলেও উত্তেজিত জেহাদি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় হিন্দুদের অভিযোগ, মৌলবাদী শক্তি পরিকল্পনা করেই এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। তাদের অভিযোগ, কোনো রাতের অন্ধকারে কেউ মন্দিরে প্রবেশ করে এবং প্রতিমার কাছে কোরান রেখে দেয়। তারপর সেই ছবি পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তার কারণেই হিন্দুদের পূজামণ্ডপে আক্রমণ চালানো হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ।

হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর মৌলবাদীদের হামলা সারা বাংলাদেশ জুড়ে চলছে। কুমিল্লা থেকে শুরু হয়ে দেশের অন্যান্য জেলাতেও হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপরে মৌলবাদীদের হামলা অব্যাহত।

বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, মৌলবাদীরা নোয়াখালি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তাণ্ডব করেছে। জানা গিয়েছে নোয়াখালি জেলার হাতিয়া উপজেলার অন্তর্গত ওছাখালি গ্রামে কয়েকশো মুসলমান জনতা হামলা চালায়। গ্রামের একের পর এক হিন্দু বাড়িতে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়।

শুধু তাই নয় গ্রামের মাস্টারপাড়ার মা কালীর মন্দিরটিকে নিশানা করে মৌলবাদীরা। ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্কিত হিন্দু সংখ্যালঘু সমাজের মানুষজন।

> “সর্বশেষ সিসিটিভি ফুটেজে প্রমাণ হয় যে, ইকবাল হোসেন নামে এক মৌলবাদী রাতের অন্ধকারে ওই পূজামণ্ডপে কোরান রেখে আসে। এ থেকে এটিই প্রমাণ হয় যে, বাকি হিন্দুদেরও বাংলাদেশ ছাড়া করতে এ এক গভীর ষড়যন্ত্র।”

এর পাশাপাশি বাংলাদেশের চাঁদপুর জেলা থেকেও মৌলবাদীদের হামলার ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সেখানকার হাজিগঞ্জের শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউ ঠাকুরের মন্দিরে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ— ‘বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের অবস্থা ভয়াবহ। আমরা আসামিদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’

ঢাকায় স্থানীয় মুসলমানদের আপত্তিতে মন্দিরের দুর্গাপূজা বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ। রাস্তায় মূর্তি রেখে পুজো করতে বাধ্য করা হয়। হিন্দুদের প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকা শহরের টিপু সুলতান রোডের শঙ্খনিধি মন্দির চত্বর। জানা গেছে, প্রতি বছর টিপু সুলতান রোডের ওই প্রাচীন মন্দিরে দুর্গাপূজা হয়ে এলেও এ বছরে ওই মন্দিরে পূজায় আপত্তি জানায় স্থানীয় মুসলমানরা। অথচ ওই মন্দির প্রাচীন মন্দির হিসাবে সরকারি নথিপত্র ও রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। তারপরেও পূজা করতে না দেওয়ায় সমস্যার সূত্রপাত। কিন্তু ১১ অক্টোবর সকালে বাংলাদেশ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সমেত একাধিক সংগঠনের নেতারা মন্দিরে পূজা করতে চেয়ে প্রতিমা নিয়ে গেলে গণ্ডগোল শুরু হয়। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাধা দেয় হিন্দুদের। এদিকে স্থানীয় মুসলমানরা বড়ো সংখ্যায় মন্দির চত্বরে জড়ো হয়ে ‘আল্লাহু আকবর’ স্লোগান দিতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ হিন্দুরা রাস্তায় পূজা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বারবার। প্রায় রোজই দেশটির কোথাও না কোথাও হিন্দুর ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপরে হামলার ঘটনা ঘটছে। এবার ঘটনা চট্টগ্রামের। মণ্ডপে প্রতিমা আনার সময়ে দুর্গা

ফঃ ২

প্রতিমার ওপরে হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় এক দুষ্কৃতী। হামলায় প্রতিমার হাত ভেঙে যায়। তাতেও না দমে গিয়ে ওই ভাঙা প্রতিমাকেই বরণ করে মণ্ডপে তোলেন হিন্দুরা। ১০ অক্টোবর চট্টগ্রামের শ্রীশ্রী শ্মশানেশ্বরী শিব মন্দির কমিটির দুর্গা প্রতিমা আনার পথে এক ব্যক্তি দুর্গা প্রতিমা লক্ষ্য করে বড়ো একটি বাতাবি লেবু ছুঁড়ে মারে। তার আঘাতে দুর্গা প্রতিমার হাতের অনেকটা ভেঙে যায়। তবে ওই ট্রাক দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তাকে ধরা সম্ভব হয়নি। পরে ঘটনার তদন্তে নেমে এক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে পুলিশের তরফে ধৃতের সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

প্রতি বছর দুর্গা পূজা এলেই প্রতিমা ভাঙার উৎসব শুরু হয়ে যায় প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে। এ বছরেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ইতিমধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিমা ভাঙার খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই ধারা বজায় রেখে গাইবান্ধা জেলা থেকেও প্রতিমা ভাঙার খবর পাওয়া গিয়েছে। গত ৭ অক্টোবর, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার তারাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের খবর সামনে এসেছে। থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

জানা গেছে তারাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত চাচিয়া-মীরগঞ্জ- সাহাপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির প্রতিমা নির্মাণ প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছিল। কিন্তু ৭ অক্টোবর সকালে স্থানীয়রা দেখেন যে মণ্ডপের ভিতরে থাকা দুর্গা প্রতিমা ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তারপরই এলাকার হিন্দুদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহম্মদ আল মারুফ, গাইবান্ধার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এ সার্কল) আব্দুল আউয়াল, থানার পুলিশ পরিদর্শক আব্দুল আজিজ, উপজেলা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি নিমাই ভট্টাচার্য। তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে উপজেলা প্রশাসনের তরফে পূজা কমিটিকে নতুন দুর্গা প্রতিমা কেনার জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। পাশাপাশি থানায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

১৫ অক্টোবর কুমিল্লার নানুয়া দিঘির পাড়ের দুর্গা পূজার মণ্ডপ থেকে প্রথম ফেসবুক লাইভ করা ফয়েজ আহমেদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করেছে সে দেশের পুলিশ।

গত ১৩ অক্টোবর সকাল সাতটায় ফয়েজ আহমেদ ওই দুর্গা পূজামণ্ডপে উপস্থিত হয়। সেই সময়ে পূজামণ্ডপে কেউ ছিলেন না। এমনকী পুরোহিতও আসেননি তখন। সেই সময়ে পূজামণ্ডপ থেকেই ফেসবুক লাইভ করা শুরু করেন ফয়েজ। তিনি লাইভ ভিডিয়োতে বলেন যে হনুমান মূর্তির কোলে কোরান রয়েছে। এমনকী লাইভ ভিডিয়োতে কোরানের অবমাননা করা হয়েছে বলার পাশাপাশি একাধিক উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন।

সেই ভিডিয়ো ফেসবুকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পূজামণ্ডপ বন্ধ করলে এবং কোরান উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজিত জনতা ভিড় করে ওই পূজা মণ্ডপের সামনে। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তারপর পূজামণ্ডপে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি দুর্গা মূর্তি ভেঙে খালে ফেলে দেওয়া হয়। পরে তদন্তে নেমে হিন্দুবিরোধী দাঙ্গায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে ফয়েজ আহমেদকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সে কুমিল্লার সদর উপজেলার রঘুরামপুরের বাসিন্দা। এত সকাল সকাল দুর্গামণ্ডপে সে কি করে পৌঁছল তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। যদিও তাঁর পরিবারের দাবি সে সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিল। কিন্তু মণ্ডপে যাওয়া ও কোরান দেখতে পাওয়ার ঘটনা পরিকল্পিত কিনা, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সর্বশেষ সংবাদ অনুসারে (১৭.১০.২০২১) ইসকনের তরফে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর মুসলমানদের তাণ্ডবের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান জানিয়েছেন এই বছরে বাংলাদেশে ৩২০০০ দুর্গাপূজা হয়েছে, তার মধ্যে ৩০টি মণ্ডপ/মন্দিরে মুসলমানরা হামলা করেছে। ইসকনের কর্মকর্তা পার্থ দাস-সহ তিনজন হিন্দু নিহত হয়েছে জেহাদি তাণ্ডবে। আরও অনেকে আহত হয়েছেন। ইসকনের ভারতস্থ কর্তা আনন্দবর্ধন দাস বলেছেন, পুলিশ প্রশাসন যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা নিত তাহলে এই জঘন্য হত্যা ও বর্বরোচিত একতরফা মুসলমান আক্রমণ ঠেকানো যেত।

প্রাক্তন মন্ত্রী হাসানুল হক জানিয়েছেন যে এটা কোনো দাঙ্গা নয়। প্রকারান্তরে তিনি জানিয়েছেন যে কিছু জঙ্গি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা সরকারকে বিব্রত করার জন্য এই কাজ করেছে। এমন নয় যে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের দাঙ্গা হয়েছে।

কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের তরফে জানতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রতি বছর কেন একতরফা হিন্দুদের উপরই আক্রমণ চালায় মুসলমানরা? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভারতে ঘটা কোনো ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যেন এরকম না হয়। আসাদুজ্জামান হক বলেছেন যে বেগম খালেদা জিয়ার দল জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ করেছে।

আর যে সব জায়গায় আক্রমণ হয়েছে — গাজীপুর, মৌলভিবাজার, কুলাউড়া, লক্ষ্মীপুর, রাগতি, উলিপুর, কুলিগ্রাম, কক্সবাজার চকরিয়া ও পেকুরিয়, বান্দরবান জকিগঞ্জ, চৌমোহনী রামঠাকুরের আশ্রম, চকবাজার করুণাময়ী কালীমন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির, খুলনার রূপসায় মহাশ্মশানঘাট। সর্বশেষ সিসিটিভি ফুটেজে প্রমাণ হয় যে, ইকবাল হোসেন নামে এক মৌলবাদী রাতের অন্ধকারে ওই পূজামণ্ডপে কোরান রেখে আসে। এ থেকে এটিই প্রমাণ হয় যে, বাকি হিন্দুদেরও বাংলাদেশ ছাড়া করতে এ এক গভীর ষড়যন্ত্র। ◘

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির বিকার এবং রাজেশ-তাপসের স্বপ্ন

স্নেহাংশু মজুমদার

বাংলা ভাষার জন্য বাঙ্গালি অনেক বার জীবন বাজি রেখেছে। মানভূমের ভজহরি মাহাতো, ভাবিনী মাহাতো থেকে শিলচরের কমলা ভট্টাচার্য হয়ে দাড়িভিটের রাজেশ-তাপস। কিন্তু সরকারি ভাবে এই বাংলা ভাষা পরিচালনা করে কে? উত্তরটা হলো পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি। গত বেশ কয়েক দশক ধরেই বাংলা ভাষার অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছে এরা। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ফ্রান্সের আকাদেমি ফ্রঁসেজ (L'Académie Française)-এর আদলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি অঙ্গ হিসেবে। ফরাসি অ্যাকাডেমি বা আকাদেমি ফ্রঁসেজ-এর মূল কাজ হলো— (১) ফরাসি ভাষার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখা, (২) যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং (৩) নিয়মিত ভাষার সংস্কার করা।

প্রথমেই দেখে নিই, ভাষার স্বাতন্ত্র্য কীভাবে ধরে রাখা হয়। কারণ ভাষা হলো ক্রমপ্রবহমান নদীর স্রোতের মতো। ভাষা বিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট-এর মতে, 'A language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact.' পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে ভাষার মধ্যেও বিভিন্ন পরিবর্তন আসে। প্রয়োজনে অন্য ভাষা থেকে কিছু দরকারি শব্দ গ্রহণ করা হয় কিংবা নিজের ভাষাতেই স্বতন্ত্রভাবে শব্দ তৈরি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগে বিচ্ছিন্নভাবে তুর্কি ও মুঘল শাসনের প্রভাবে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু আরবি ফার্সি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আবার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের যুগ থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিভাষা, অর্থনৈতিক থেকে সামাজিক বিষয় সর্বত্র ইংরেজি শব্দ ব্যবহার এখন ভাষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অন্য ভাষা থেকে যদি কোনো ভাষায় খুব কম সময়ে জলের স্রোতের মতো অন্য ভাষার বেশিরভাগ শব্দই যদি আরেকটা ভাষার মতো হয়, তাহলে এই দুটো ভাষাকে আর আলাদা ভাষা বলে চেনা যায় না। বরং যে ভাষাটা শব্দ নিচ্ছে, সেই ভাষাটি যে ভাষা থেকে শব্দ নেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সেজন্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার অন্যতম শর্ত হলো প্রতিটি ভাষার আলাদা আলাদা শব্দ থাকা। কারণ শব্দই ভাষার মুখ্য পরিচয়।

দ্বিতীয়ত, ভাষার এগোনোর বিষয়টা। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো, ভাষা এগোবে কীভাবে? যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় নিজস্ব নতুন নতুন শব্দ তৈরি করে। তাহলে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডার কীভাবে তৈরি হবে? কারণ মানুষ নিজের প্রয়োজন অনুসারে ভাষায় নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। কোনো কঠিন ইংরেজি শব্দ বা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা উচ্চারণের অসুবিধার ফলে গ্রামাঞ্চলের মানুষ তার বিভিন্ন প্রচলিত কথ্যরূপ তৈরি করে নেয়। যেমন--- মোবাইল ফোনের গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ কথ্যরূপ 'হাতফোন'। কোথাও গেলে হাতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যায়, তাই হাতফোন। আবার 'স্মার্টফোন' কথাটা সাধারণ বাঙ্গালি বোঝেন না, কিন্তু স্মার্টফোন জিনিসটা কী সেটা তারা দেখেছেন। এবং এমনই সাদা কালো মোবাইল ফোনগুলোর সঙ্গে স্মার্টফোনের পার্থক্য কী সেটাও ভালো করে লক্ষ্য করেছেন। তাই হাওড়ার বহু অঞ্চলে বাঙ্গালিরা স্মার্টফোনকে বলেন 'বড়ো ফোন' আর সাদা কালো ফোনগুলো হলো 'ছোটো ফোন'। বলতেও সহজ, লিখতেও সহজ। আর ভেবে দেখুন, সত্যিই কিন্তু স্মার্ট ফোনগুলো অন্যান্য সাদা কালো ফোনের থেকে আকারে খানিকটা বড়োই হয়। এই একই পদ্ধতিতে ইঞ্জেকশনকে গ্রামীণ বাঙ্গালিরা সরল ভাষায় বলেন 'সুঁই দেওয়া'। গর্ভনিরোধক বড়ির নাম রেখেছেন, 'সতীবড়ি'! তারা লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রাম ও আধা শহরে মূলত অবিবাহিত মেয়েরা প্রেম করলে আর বিবাহিত মেয়ের স্বামী ছাড়া অবৈধ প্রেমিক থাকলে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব আটকাতে এরকম বড়ি খায়। অতএব তাদের চোখে এটা এমন একটা বড়ি, যেটা খেলে নানারকম অবৈধ সম্পর্ক রেখেও সমাজের চোখে দিব্যি সতী সেজে থাকা যায়। তাই এটার নাম দিয়েছেন 'সতী বড়ি'! একবার ভেবে দেখুন তো, কোনটা বলা সোজা 'গর্ভ নিরোধক বড়ি' নাকি 'সতী বড়ি'? ওই একই নিয়মে বুলেট মোটরসাইকেল চালানোর সময় ভটভট মার্কা আওয়াজ হয় বলে সহজভাবে 'ভটভটি' নাম পায়, তাই মোটর

বোট হয়েছে 'ভুটভুটি'। এইভাবে প্রতিনিয়ত শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত বাঙ্গালি, জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বহু নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিচ্ছেন, যার খোঁজ না আমরা রাখি, আর না পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি। এই শব্দগুলির উৎস মানুষের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা, তাই শব্দগুলি সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও প্রাণবন্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ত শব্দগুলির ব্যবহার ভাষার শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হবে ওঠে। সহজ সরল কথ্যভাষা হিসেবে বাংলাকে সাধারণ মানুষের প্রাণের ভাষা করে তোলে। আর এরকম স্থানীয় ভাবে তৈরি নতুন নতুন শব্দ তৈরির মাধ্যমেই একটা ভাষা এগোয়, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভাষায় এমন নব নব শব্দ সৃষ্টি হয়ে চলা সত্ত্বেও গুরুত্ব না পেয়ে কার্যত ব্রাত্য হয়েই থেকে যায়। কারণ এই সমস্ত শব্দই তৈরি হয় স্থানীয় ভাবে। সব শব্দ একই সময়ে একই জায়গায় তৈরি হয় না। কোনো শব্দ হয়তো তৈরি হলো হাওড়া জেলার কোনও গ্রামে, ওই শব্দটার প্রচলন ওই গ্রামের আশেপাশে তো হলো কিন্তু রাজ্যের বাকি অংশে হলো না। আবার কোনো বাংলা শব্দ হয়তো তৈরি হলো বাঁকুড়া কিংবা পুরুলিয়ায়, কোনোটা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলে। কিন্তু বাকিরা সেটা জানতে পারছেন না। যেখানকার মানুষ ওই বাংলা শব্দটা জানতে পারছেন না, তারা হয়তো বাধ্য হয়ে হিন্দি বা ইংরেজি শব্দ ব্যবহারে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলা ভাষায় শব্দ অনেক আছে কিন্তু যেগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট প্রচার না পেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এভাবেই বাংলা ভাষায় শব্দের কৃত্রিম অভাব তৈরি করা হচ্ছে।

এই কৃত্রিম অভাব তৈরির দায় কার? ভাষার এই সব নিত্যনতুন পরিবর্তন নথিভুক্ত কার করার কথা ছিল? অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির। ফরাসি ভাষা অ্যাকাডেমি ঠিক এই কাজগুলোই করে। প্রতি বছর ফরাসিদের তৈরি করা নতুন নতুন ফরাসি শব্দগুলোকে তারা সরকারি ফরাসি অভিধানে যুক্ত করে, সেই শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়। যাতে প্রত্যেকটা নতুন সৃষ্ট শব্দ সব ফরাসি জানতে পারে। যাতে ফরাসি ভাষায় শব্দ ব্যবহারে বাধা না হয়। এভাবেই ফরাসি অ্যাকাডেমি ভাষায় শব্দের জোগান ঠিক রাখে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমিরও অন্যতম কাজ হওয়া উচিত ছিল, রাজ্যের যেখানে যত নতুন বাংলা শব্দ তৈরি হচ্ছে সেগুলো অভিধানে সংকলন এবং প্রতি বছর সংযোজন করে ভাষায় শব্দের জোগান ঠিক রাখা।

কিন্তু তারা করল কি? পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি বাংলার মতো একটা সোজাসাপটা সরল ভাষাকে অহেতুক জটিল করে তুলল। ভাষাকে যুগোপযোগী করার নামে কিছু বহুল প্রচলিত ইংরেজি শব্দের যান্ত্রিক বাংলা নামকরণ করল। এই যান্ত্রিক শব্দগুলো বাংলা অ্যাকাডেমির অভিধানে জায়গা পেল, সরকারি কয়েকটা দেওয়ালে জায়গা পেল। কিন্তু মানুষের মুখে বা লেখায় উঠে এল না। কারণ শব্দের কাজ দুটো, কোনো বিষয় বা ভাবনাকে ব্যক্ত করা। অর্থাৎ ওই কথাটা বললে যেন একটা বিশেষ জিনিস বা তার অর্থ বোঝায়। আর দ্বিতীয় কাজ হলো সেটা যেন ব্যবহারের যোগ্য হয়। টেলিফোনের বাংলা 'দূরভাষ' করলে কিংবা মোবাইল ফোনের বাংলা 'চলভাষ' করলে সেটার মানে হয়তো বোঝা যায় কিন্তু কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। বাঙ্গালিদের জিভে এগুলো আটকে যায়। বরং গ্রামীণ মানুষের মুখের ভাষা 'হাতফোন' অনেক বেশি সাবলীল। এগুলোই মান্য বাংলা। কারণ এগুলোই সাধারণ বাঙ্গালির কাছে মান্যতা পেয়েছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি এই শব্দগুলো গ্রহণ করতে নারাজ। অ্যাকাডেমি তাদের যান্ত্রিক শব্দের বাইরে খুব কমই এমন শব্দ বানাতে পেরেছে যেটা সব বাঙ্গালির কাছে মান্যতা পেয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাংলা অ্যাকাডেমির বানানো একটাই শব্দ আপামর বাঙ্গালির কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সেটা হলো মেট্রোরেলের বাংলা অর্থ 'পাতাল রেল'। এটা নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী নির্বাচন, যা আজও স্বতস্ফূর্তভাবে কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত মান্য বাংলা শব্দগুলোকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির স্থান দিতে না চাওয়ার কারণ কী? রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ গ্রহণ করা তো খুব বড়ো কোনো ব্যাপার নয়। জেলায় জেলায় একটি করে বাংলা অ্যাকাডেমি স্থাপন করা যেতেই পারে, যেগুলো মূল কেন্দ্রীয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এসব জেলা বাংলা অ্যাকাডেমির কাজ হবে সেই জেলার নিজস্ব প্রচলিত বাংলা শব্দগুলোকে সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় বাংলা অ্যাকাডেমিকে দেওয়া। কেন্দ্রীয় বাংলা অ্যাকাডেমি এই সকল শব্দ সংকলন করে প্রতি বছর নতুন অভিধানে সেগুলো যোগ করবে। শুধু ফরাসি নয়, ইংরেজি-সহ সমস্ত ইউরোপিয়ান ভাষা এই নিয়মেই চলে। এজন্য ওসব ভাষায় শব্দের কোনো অভাব নেই। বাংলা ভাষাও পারে অকারণ বিদেশি শব্দের ভার ঝেড়ে ফেলে পুরোপুরি সাবলীল হতে।

আজকাল বাঙ্গালি প্রায়ই একটি হিন্দি শব্দ 'আওকাত' ব্যবহার করছে, এটা আসলে একটা আরবি শব্দ যার অর্থ ক্ষমতা। এর পরিবর্তে কথ্য বাংলায় 'দম', বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় 'মুরোদ', কলকেতিয়া বাংলায় 'ক্যালমাঈ' বা ঢাকাইয়া বাঙাল উপভাষায় 'হ্যাডাম' থাকা সত্ত্বেও এই শব্দগুলো বাংলা অভিধানে জায়গা পায়নি। সে কারণে যে সব লেখক, সাংবাদিকরা বাংলায় লেখেন, তারাও এসব শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন না। তাই হিন্দি সিনেমা দেখে তারাও লিখছেন, 'আওকাত'। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির নিষ্ক্রিয়তায় এবং বলিউডের প্রত্যক্ষ প্রভাবে হিন্দির আড়ালে বহু আরবি ফারসি শব্দ বাংলায় ঢুকছে, তেমনই হারিয়ে যাচ্ছে বহু প্রচলিত কথ্য বাংলা শব্দ।

এই শব্দগুলো সংরক্ষণে আমাদের অবশ্যই সচেতন হওয়া উচিত, কারণ ভাষার ব্যবহার্য রূপ এখানেই এবং এর জায়গা অন্য কোনো ভাষার শব্দ নিলে ভাষার মৌলিকতা বলে কিছুই থাকবে না। একই ভাবে বিভিন্ন বাংলা শব্দ সরে গিয়ে উর্দু আরবি ফার্সির চূড়ান্ত অনুপ্রবেশের ফলে বাংলা ভাষা তার

স্বাভাবিক মিষ্টতা ও ঐতিহ্য ধীরে ধীরে হারাতে বসেছে। এই কারণেই বাংলা ভাষার সংস্কার দরকার আর সেটা এখনই। মনে রাখতে হবে, সংস্কার মানে নতুন নতুন জিনিস যোগ করা নয়। বরং ভাষাকে তার মূল শিকড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাংলা ভাষার শিকড়ে তো বাংলাই রয়েছে। অতএব বাংলা ভাষাকে তার শিকড়ে ফেরাতে গেলে বেছে বেছে আরবি ফারসি ও অন্যান্য বহিরাগত সমস্ত শব্দকে একে একে বাদ দিতে হবে। কিন্তু বাদ তখনই দেওয়া যাবে যখন সেই সমস্ত মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যথেষ্ট বাংলা শব্দ আমাদের হাতে থাকবে।

তৃতীয়ত, ভাষা সংস্কার করতে গেলে সেটাকে সঠিক পদ্ধতিতে করতে হবে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি সংক্রান্ত বড়ো বড়ো ইংরেজি শব্দের খটোমটো যান্ত্রিক বাংলা না বানিয়ে সাধারণ বাঙ্গালির তৈরি করা সহজ সরল শব্দ গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ভাষা প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর অন্তর রূপ পালটায়। এগুলো সবই বাংলা উপভাষা। প্রতিটি উপভাষায় নিজস্ব কিছু শব্দ রয়েছে। এই শব্দগুলো গ্রহণ করলে শব্দের অভাব যেমন মিটবে, বহু বিদেশি শব্দকে বাংলা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালি একে অপরের উপভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। এক উপভাষার ব্যবহার্য শব্দ প্রয়োজন অনুসারে অন্যরা গ্রহণ করলে বাঙ্গালিদের মধ্যে মৈত্রী ও নৈকট্য গড়ে উঠবে। এতেই আমাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য সুদৃঢ় হবে। আজ যে বাংলার বিভিন্ন উপভাষার মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি তার অন্যতম কারণ একে অপরের উপভাষা (ডায়ালেক্ট) বুঝতে না পারা এবং সেগুলো নিয়ে অযথা হাসি-ঠাট্টা করা। মেদিনীপুর বা উত্তরবঙ্গের উপভাষা কলকাতার লোকে বুঝতে পারে না, এটা দোষের নয়। কারণ পারস্পরিক উপভাষা বুঝতে পারার কোনো মাধ্যম তো তৈরি হয়নি। এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সরকারি অভিভাবক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি বিরাট ভূমিকা নিতে পারত, কিন্তু নেয়নি। আগামীতেও যে নেবে, তার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। কারণ ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি টুকতে শিখেছে। বাংলাদেশ বাংলা অ্যাকাডেমির নিয়ম নীতিগুলো নকল করে, এখানেও বাংলাদেশের আরবি-ফারসি অধ্যুষিত বাংলা চালু করতে এরা অদ্ভুত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

উপভাষা বাঁচলেই ভাষা বাঁচবে। উপভাষা মন্থন করলেই শব্দ উঠে আসবে। আর এইভাবে বাঙ্গালির কথ্যভাষা সংরক্ষণ করে বাংলার মধ্য থেকে উর্দু, আরবি, ফারসি শব্দের সংখ্যা যদি একেবারে শূন্য করে ফেলা যায়, সেটাই হবে রাজেশ-তাপস-সহ বাংলা ভাষার সৈনিকদের প্রতি সঠিক সম্মান প্রদর্শন।

এই অবস্থায় বাঙ্গালি কী বসে থাকবে? অপেক্ষা করবে কবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমির চেতনা জাগবে, শুভবুদ্ধির উদয় হবে? নাকি বাঙ্গালি তার নিজের উদ্যমে উপর থেকে চাপানো এই অকর্মণ্য বাংলা অ্যাকাডেমিকে ঝেড়ে ফেলে নিজস্ব 'ভারতীয় গণ বাংলা অ্যাকাডেমি' স্থাপন করবে? বাংলা ভাষাটা যখন বাঙ্গালিরাই তৈরি করেছে তাহলে এই ভাষা টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও বাঙ্গালির। পশ্চিমবঙ্গ হলো বাঙ্গালির আপন ভূমি। এই বাঙ্গলার মাটিতে দাঁড়িয়ে উর্দু সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে প্রাণ দিয়েছে রাজেশ, তাপস। ভেবে দেখুন তো, যদি বাংলার মধ্যেই উর্দু ঢুকে বসে থাকে, তাহলে রাজেশ তাপসের বলিদান ব্যর্থ হয়ে যাবে না কি? তাই বাংলা ভাষার ঐতিহ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এখনই দরকার 'ভারতীয় গণ বাংলা অ্যাকাডেমি'। এর কাজ হবে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা, আন্দামান, ঝাড়খণ্ডের প্রতিটি জেলায় বাঙ্গালিদের মধ্যে অন্য ভাষার থেকে স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নিজস্ব কী কী শব্দ প্রচলিত সেগুলো সংগ্রহ করে অভিধানে নথিভুক্ত করা। বাংলায় ঢুকে থাকা আরবি ফারসি শব্দগুলোর সহজ বাংলা খুঁজে না পেলে, অনলাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। দশ কোটি বাঙ্গালি মাথা খাটালে শব্দ ঠিকই বেরোবে। বাংলাদেশি শিল্পী না এনে ভারতের বাঙ্গালিদের নিয়েই কবির লড়াই বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোক, যেখানে বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্পীরা এসে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা, গান বা নাটকের নিদর্শন রাখবেন। এতে করে বাংলার সমস্ত উপভাষার মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে। আঞ্চলিক বাংলা বিতর্কের আয়োজনও হতে পারে যেখানে প্রতিযোগীরা নিজস্ব আঞ্চলিক বাংলায় তর্কের আসর জমাতে পারবেন। বিভিন্ন জেলার বাঙ্গালির কাছে এই বার্তা পৌঁছক যে আমাদের সকল উপভাষা এই একই বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপ।

আর ভাষা তো আসলে বিভিন্ন উপভাষারই সমষ্টি। উপভাষা মরে গেলে ভাষাটাও আস্তে আস্তে মরে যায়। কারণ ভাষায় শব্দের জোগান ঠিক রাখে উপভাষাগুলোই। অতএব উপভাষা বাঁচলেই ভাষা বাঁচবে। উপভাষা মন্থন করলেই শব্দ উঠে আসবে।

আর এইভাবে বাঙ্গালির কথ্যভাষা সংরক্ষণ করে বাংলার মধ্য থেকে উর্দু, আরবি, ফারসি শব্দের সংখ্যা যদি একেবারে শূন্য করে ফেলা যায়, সেটাই হবে রাজেশ-তাপস-সহ বাংলা ভাষার সৈনিকদের প্রতি সঠিক সম্মান প্রদর্শন। ▯

এক যুবতীকে জিপের মধ্যে ছুড়ে ফেলল তালিবান জঙ্গিরা

দুর্গাপদ ঘোষ

নাহ্, নূরজাহান মেয়েটার সঙ্গে আমার আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তান দখল করার পর সেখানকার নূরজাহানদের ওপর তালিবান জঙ্গিদের বর্বরতার যেসব খবর শুনেছি এবং টিভির পর্দায় সামান্য যে কয়েকটা ছবি দেখেছি তাতে আঁতকে উঠেছি। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক এক দশক আগে দেখা হওয়া মাস কমিউনিকেশনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করা সেই নূরজাহানের অভিব্যক্তি দেখার জন্য আজ চোখ মেলে আছি। সেদিন তাঁর মন-মানসিকতায় সে স্বর্গীয় দীপালোক দেখতে পেয়েছিলাম, আশা করি এখনো তা এতটুকুও ম্লান হয়ে যায়নি। অবশ্য দুটো দৃশ্যপটে দুই চিত্র আমি যে কতখানি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবো সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিৎ নই।

প্রথম দৃশ্য : ২৮ আগস্ট, ২০১১। স্থান : মধ্য কলকাতার গণেশ এভিনিউ সংলগ্ন রহমতভাই নার্সিং হোম। সময় : প্রাক মধ্যাহ্ন। আমার দেড় বছরের নাতনিকে নিয়ে ট্রিপল অ্যান্টিজেন এবং পালস পোলিও প্রতিষেধকের জন্য গেছি। রিসেপশন রুম ভিড়ে ঠাসা। বসার কোনো জায়গা খালি নেই। কাউন্টারে নাম লেখানোর সময় খেরোর খাতায় সংশ্লিষ্ট কর্মী যেখানে এন্ট্রি করলেন, বুঝলাম, অন্তত ঘণ্টা দেড়-দুইয়ের আগে ডাক পড়বে না। কোনো চেয়ার যদি খালি হয় এই আশায় এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আগতদের মধ্যে বেশিরভাগই শিশুকোলে মহিলা এবং আপাদমস্তক বোরখা পরা। তবে সকলেরই মুখের সামনের পরদা তোলা। বোধহয় মিনিট দুয়েক হবে। সামনের চেয়ারে এতক্ষণ কোলের শিশুপুত্রের দিকে মুখ নামিয়ে বসে থাকা বোরখা পরা মহিলা হঠাৎ যেন শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, 'you take this seat uncle.' ভাবলাম ডাক পড়েছে তাই উঠে যাচ্ছেন। বসলাম। কিন্তু মিনিট পাঁচেক কেটে যাবার পরও দেখি, তিনি দাঁড়িয়েই আছেন। মুখ তুলে বললাম, এখনো তো দেখছি আপনার ডাক আসেনি। বাচ্চা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কেন? চেয়ার ছেড়ে উঠতে গেলাম। তড়িঘড়ি বাধা দিয়ে বললেন, 'No, no. Please uncle, be seated. You are an aged person, shouldn't we respect our elders? I haven't any problem to stand for long.' অগত্যা কী আর করবো! এই প্রথম তাঁর মুখখানা ভালো করে দেখলাম। অনিন্দ্যসুন্দর লাবণ্যময়ী। মুখমণ্ডলে যেন পূর্ণিমার চাঁদ এসে আটকে গেছে। এক নজরে মনে হলো আমার মেয়ের চেয়ে বয়েস কিছুটা কমই হবে। কী সম্বোধন করবো, মা, না বোন। শেষ পর্যন্ত মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'you are geting trouble for me ma'm...।' কথাটা শেষ হবার আগেই একটু হেসে খুব বিনম্রভাবে বললেন, 'No 'ma'm' please. I'm like your daughter. Isn't it our traditional culture?' কথাগুলো কানে যেন মধু ঢেলে দিল। এরপর ইংরেজি, হিন্দি এবং খুব ভাঙা ভাঙা বাংলা মিশিয়ে বললেন, 'ঔর হামাকে 'আপনি' বোলবেন না। 'তুমি' বোললে জাদা হ্যাপি হোবে।' এমন সময় ঠিক পাশের চেয়ারটা খালি হলে ও বসল। অবাক বিস্ময়ে ওকে দেখছিলাম। এবার আর 'ম্যাম' নয়, বললাম, 'May I Know your name Mom?' 'মা' সম্বোধনটা শুনে কেন জানি না কিছুক্ষণ করুণ চোখে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে বলল, 'নূরজাহান।' শুনে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'-এর কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে স্বস্তিলাভ করলাম এই ভেবে, নামকরণকালে এর মা-বাবাকে অন্তরীক্ষে থাকা বিধাতাপুরুষের হাসি-বিদ্রূপের কারণ হতে হয়নি!

রূপ-লাবণ্যে মেয়েটি সত্যিই এ জাহানের (পৃথিবী) মধ্যে অমূল্য রত্ন। এক সময় বললাম, আমাদের সাংস্কৃতিক পরম্পরার কথা বলছিলে। তুমি কি আদতে হিন্দু মেয়ে, মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে? শুনে খুব হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'No uncle, from the grandfather of my grandpa we are Indian Muslims. But...' কী যেন একটু ভাবল। এরপর সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রীতিমতো সংকোচের সঙ্গে জানতে চাইল, 'May I ask where is her Parent?' বললাম, এর বাবা-মা দুজনেই অফিসে গেছে। আমার মেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি নিয়ে আসবে। বলতে বলতে সে এসেও গেল। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর দুজনে কথা বলতে লাগল। তা থেকে জানতে পারলাম ও আদতে সিন্ধী, তবে অনেক পুরুষ ধরে রাজস্থানে আছে। ওর জন্ম বিকানীরে। আমার পেশা সবার পিছনে কাঠি দেওয়া (সাংবাদিকতা) শুনে খুব আগ্রহ প্রকাশ করে নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যেতে লাগল। এক সময় নিজেই বলল, 'I can openly say that India is the safest country in the world for all religious community, specialy for women. And I'm sure that is because of the majority Hindus.' আমার তো চোয়াল ঝুলে পড়ার দশা। অ্যাঁঃ...! বলে কী এ মেয়ে! ঘোর কাটার আগে ফের বলল, 'Uncle, further I want to say that no Muslim is more safe rather than this country... yes, not even in any proscribed Muslim country.' আমরা ওর মুখের দিকে চোখ প্রায় গোল গোল করে তাকিয়ে রইলাম। কী ভাবল জানি না। ফের বলল, 'I don't bother uncle, you can express it in your write-up quoting my name.' মুচকি হেসে বললাম, তার মানে ভারতবর্ষ এবং হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে তোমার অন্তত কোনো উন্নাসিকতা নেই! সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল 'I simply can't think of it. :'। হামলোগ জো হাউসিং কমপ্লেক্সে থাকে, There are

only two Muslim families and a Single christian. ওঁর সোবাই হিন্দু আছে। But we never feel scared or afraid, not even isolated. শুনে নিজের ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে রীতিমতো গর্ব অনুভব করছিলাম। আমার মেয়ে বলল, তুমি এত লিবারেল, উচ্চশিক্ষিতা, বোরখা পরে থাকো কেন ভাই? নূরজাহান জানালো, সব সময় পরে না। কেবল বাইরে বেরুলে ব্যবহার করে। ওর ব্যাখ্যা, তাতে ধুলোবালি, নোংরা ও অন্যান্য দূষণের থেকে খানিকটা রক্ষা পাওয়া যায়। ওর সেদিন কী হয়েছিল কে জানে, কিংবা হয়তো ও ওরকমই, অনর্গল মুখে যেন খই ফুটতে লাগল। বলে যেতে লাগল, বোরখার চল ইসলামিক জমানায় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু তার প্রবর্তন হয়েছে ইসলামের অনেক আগে থেকে। এমনকী 'হাজার এক আরব্য রজনী'-র গল্পেও পাবেন তখনকার নারী-পুরুষরা বোরখা-আলখাল্লা ব্যবহার করতো। সেসব কাহিনি তো ইসলাম প্রবর্তনের অনেক আগের। মেয়েটা অনেক কিছু জানে বটে। তখনো আমাদের কারও ডাক পড়েনি। কথায় বলে, ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। কথায় কথায় বললাম, একটু আগে তুমি ভারতীয় সংস্কৃতি-পরম্পরার কথা বলছিলে শুনে বড়ো ভালো লাগল। এখন একজন প্রবীণ সাংবাদিক হিসেবে যদি জানতে চাই ভোট দাও কাকে, তার উত্তর পাবো কি? এবার একেবারে রহস্যময় হাসি। 'Excuse me Uncle, I Won't disclose that. তবে ইয়ে বলতে পারে যে হামি যাকে cast করি they may not able to form govt. in Bengal in near future.' কারণটা জানতে চাইবার আগেই আবার বলে গেল, 'But whether they can or not, I soleheartedly prefer to them because of their humanitarian idology. Till...' ওর ডাক পড়ল। বলতে বলতে গেল, 'Till this idology remains, everybody is safe here. Yes..., Yes,... comming... comming...।

দ্বিতীয় দৃশ্য : ২০২১ সালের ২৮ আগস্ট। স্থান : আফগানিস্তানের হীরাট শহর। সময় : প্রাক মধ্যাহ্ন। প্রকাশ্য দিবালোকের শহরের এক রাজপথ ধরে সসংকোচে হেঁটে চলেছেন তিনজন মহিলা। তাঁদের একজন যুবতী। বাকিদের একজন মাঝবয়েসি, অন্যজন প্রৌঢ়া। সকলেরই পরনে সালোয়ার-কামিজ ও মাথায়

ওড়না। রাস্তায় তেমন ভিড় নেই আবার ফাঁকাও নয়। সামান্য কয়েকদিন আগে তালিবান জঙ্গিদের দখলে চলে গেছে গোটা শহর। স্বঘোষিত নতুন মেয়র ফরমান জারি করেছেন মেয়েদের বোরখা পরতে হবে। তারা স্কুল-কলেজে যেতে পারবে না। অফিস-কাছারিতে তো নয়ই। মেয়েদের কাজ কেবল সন্তানের জন্ম দেওয়া ইত্যাদি। মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত। নিতান্ত অনিবার্য না হলে মেয়েরা বাড়ির বাইরে বেরচ্ছেন না। এঁদের নিশ্চয় তেমনই কোনো অনিবার্য কাজ ছিল। পদচালনা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই রাস্তার একপাশ দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। এমন সময় সামনের দিক থেকে একটা জিপ এসে ক্যাঁ...চ করে দাঁড়ালো। তিন মহিলা রাস্তার আরও একটু ধার ঘেঁষে পায়ের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলেন। জিপ থেকে রক্তলোলুপ হিংস্র নেকড়ের মতো লাফ মেরে নেমে এল রাইফেল হাতে মূর্তিমান দুই দানব। সটান যুবতীর সামনে হাজির হয়ে তাঁকে তাদের সঙ্গে জিপে উঠতে বলল। কাতর স্বরে 'না' বলতেই একজন তাঁর দিকে রাইফেল তাক করল অন্যজন তাঁর হাত ধরে টানাহ্যাঁচড়া করতে লাগল। সঙ্গের দুই মহিলা বাধা দিতে গেলে বন্দুকের ঘায়ে তাঁদের মাটিতে ফেলে দিয়ে দুজনে মিলে যুবতীকে মাটিতে ফেলে চ্যাংদোলা করে একতাল কাঁচা মাংসের মতো ছুঁড়ে ফেলল জিপের মধ্যে। মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল জিপ। কোথায় নিয়ে গেল তাঁর আর সন্ধান মিলল না। দুই মহিলা জিপের পিছনে একটুখানি দৌড়ে হতাশায়, যন্ত্রণায় রাস্তার মাঝখানে বসে পড়ে দুহাতে বুক চাপড়াতে লাগলেন। সবাই বুঝল যুবতীর দুর্ভাগ্যের কপালে দানবদের আদিম প্রবৃত্তির পাশবিক নির্যাতন ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁকে যদি তখন গুলি করে শেষ করে দিত তাহলে হয়তো তিনি এই নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেন, মরে বাঁচতেন। কেবল আমি নই, সেদিন গোটা বিশ্বের মানুষ টিভি-র পর্দায় এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছেন, যেমন সেদিনই দেখেছেন আরও একটা পৈশাচিক দৃশ্য। আফগানিস্তানের বড়ো শহর জালালাবাদে বোরখায় ঢাকা না থাকার জন্য দুজন মাঝ বয়েসি মহিলাকে প্রকাশ্য স্থানে সপাং সপাং করে একের পর এক বেত মারা হচ্ছে। এক একটা ঘায়ের পর তীব্র যন্ত্রণায় তাঁদের দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখার পর অনেকদিনের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। সেদিন অবশ্য চাবুক ছিল না। 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' কলকাতার মেয়ে সুস্মিতা ব্যানার্জিকে ২০১৩ সালে আফগানিস্তানে তালিবানরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল।

দিনের পর দিন, নিরন্তর চোখ মেলে দেখার অযোগ্য এইসব নারকীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে এবং শুনতে শুনতে আজ আমরা ক্লান্ত। আজ সেই নূরজাহানের সঙ্গে দেখা হলেও হয়তো ওর মতো করে বলতো, Hell Uncle, Hell. হয়তো ওর দীপালোকের মতো মানসিকতা অভিব্যক্ত করে বলতো, Didn't I tale you that, noboody is more safe anywhere than our India? Now everybody does feel that no Heaven, no Hell is too far from us. ▯

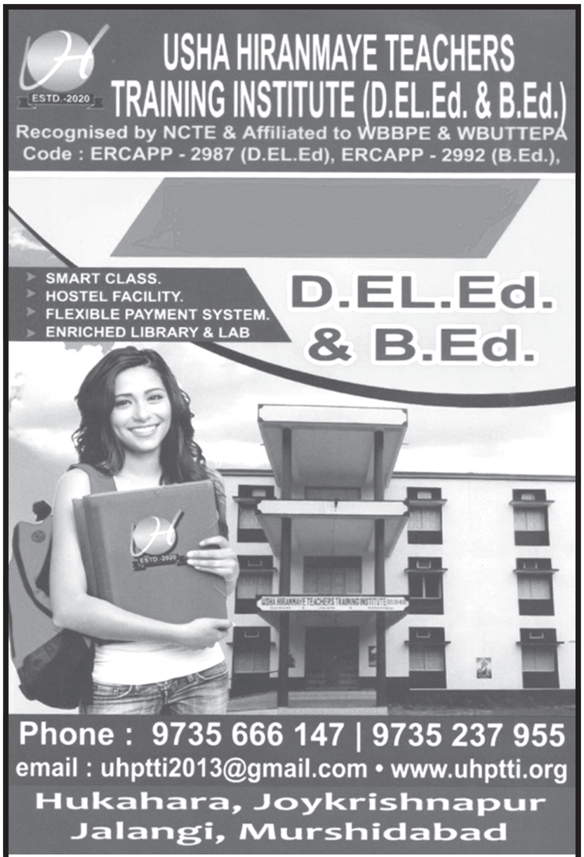

Shri Nripendranath Mondal
Secretary

USHA HIRANMAYE TEACHERS TRAINING INSTITUTE

Mobile No. 9735666147

সমগ্র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাবাসীকে দীপাবলী, ছট ও জগদ্ধাত্রী পূজার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই—

ভারতীয় জনতা পার্টি

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা
সদরঘাট রোড, বালুরঘাট
জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর
পিন - ৭৩৩১০১
মোবাইল ঃ ৮৩৭২৮১৭৭৬০,
৯৪৩৪৩৪৭৩৮৬

সুদীনকুমারের পুজোর বাক্সে থাকত পঞ্চমুণ্ডির সিদ্ধাসন

হীরক কর

দিঘার সাগর সৈকত। তারপাশেই বড়ো হোটেলের দোতলায় একটা কামরা। তিনি যখন পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দোতলার ঘরে প্রথম ঢুকেই দেখলেন একটা ড্রইং রুম। তারপরেই একজোড়া খাটযুক্ত বেডরুম, সংযুক্ত স্নানাগার এবং শোবার ঘরের সামনে একটা ছোটো ব্যালকনি। ঘরে ঢোকা মাত্র একটা বীভৎস গন্ধ নাকে এলো। যা কিনা তিনি ভুতুড়ে পরিবেশেই পান। ব্যালকনিতে এক কাপ চা নিয়ে বসলেন। চা দিয়ে বেয়ারা চলে যেতেই টর্চ নিয়ে ঘরের মধ্যে ওই গন্ধের উৎস অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

বেশ বুঝলেন, গন্ধটা আসছে বাথরুম থেকে। বাথরুম ছেড়ে শোয়ার ঘর বা ব্যালকনিতে এসে সেই গন্ধটা আর পাওয়া যাচ্ছিল না। টর্চ জ্বেলে বাথরুমে ঢুকতেই সেই গন্ধ তীব্র হয়ে উঠলো। তার বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হলো না যে সেই বাথরুমেই ডেরা বেঁধেছে প্রেতাত্মা। আলো জ্বেলে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কিন্তু কারোরই দেখা পেলেন না। কিন্তু সেই উৎকট গন্ধটা অস্থির করে তুলল। পুনরায় ব্যালকনিতে এসে বসলেন। প্রতীক্ষা তখন নিশুতি রাতের। দিনের শেষে ক্লান্ত শরীরটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলেন। হঠাৎ মনে হলো বাথরুমের শাওয়ার খুলে কেউ যেন স্নান করছে। ইতিমধ্যেই তার পুজোর বাক্সটাকে খুলে ফেলেছেন। বাক্সের নীচে ছিল পঞ্চমুণ্ডির সিদ্ধাসন। ত্রিশূল আর তার স্ট্যান্ডটাকে বার করে খাটের পাশে জানলার উপর বসিয়ে রেখেছিলেন। এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে ত্রিশূল নিয়ে ছুটলেন বাথরুমে। গিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নেই। আছে সেই উৎকট গন্ধ। শাওয়ার খোলা। ফিনকি দিয়ে তার জলের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। অথচ, কিছুক্ষণ আগেই তিনি শাওয়ার বন্ধ করে এসেছিলেন। শাওয়ার বন্ধ করে তিনি বিছানায় এসে শুলেন। মিনিট পনেরো পরে পুনরায় আবার শাওয়ার খোলার শব্দ। নিমেষের মধ্যে ত্রিশূল হাতে ছুটলেন বাথরুমে। যথারীতি কেউ কোথাও নেই। বীভৎস গন্ধটা বিদ্যমান। ভেতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন। বিশেষ ক্ষমতা বলে ডেকে আনলেন সেই প্রেতাত্মাকে। যিনি আনলেন তিনি সুদীনকুমার মিত্র। ভারতবর্ষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রসাধকদের অন্যতম। অথচ পেশায় সরকারি অফিসার। আবগারি সুপারিনটেন্ডেন্ট।

সামনে এসে দাঁড়াল শীর্ণকায়া অবিবাহিত এক তরুণী। সুদীনকুমারের মনে হলো, মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। জিভটাও ছিল খানিকটা বার করা। সারাটা গলা জুড়ে কালো একটা দাগ। কণ্ঠনালীর দুপাশে দুটো সুস্পষ্ট ঘন কালো দাগ। সেই অবস্থায় সুদীনকুমার পবিত্র ত্রিশূলটাকে তার সামনে উঁচু করে ধরে কটমট করে তাকিয়ে থাকলেন। তরুণী প্রেতাত্মা তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। তার চোখে তখন বেদনাদায়ক কাতর চাউনি। সেই জানাল, তার নাম ঋতা। বয়স ২২। তার ভগ্নীপতি নীহার তাকে নিয়ে এসেছিল দিঘায়। উঠেছিল এই ঘরে। আসল পরিচয় না দিয়ে হোটেলে পরিচয় দিয়েছিল তারা খ্রিস্টান দম্পতি। নীহার তাকে দিয়েছিল বিবাহের প্রস্তাব। ঋতার ছিল কড়া জবাব, তার দিদির জীবিত অবস্থায় তার পক্ষে নীহারকে বিয়ে করা অসম্ভব। তখনই নীহার ঋতার বুকের উপর

ফঃ ৩

চেপে বসে। দুই হাত দিয়ে তার কণ্ঠনালীর দু'পাশে খুব জোরে চেপে ধরে। সে নিস্তেজ হয়ে পড়লে, মশারির কোনা থেকে দড়ি খুলে নিয়ে এসে ঋতার কণ্ঠে ফাঁসের মতো লাগিয়ে দড়িটার দু-দিকে টান মেরে দেয়। এসব কথা বলার পর ঋতা সুদীনকুমারের কাছে কাতর দৃষ্টিতে তার শান্তি এবং নীহারের নিজের মুক্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানায়।

ঋতাই জানায়, কিছুদিন পর তার দিদি জ্যোৎস্নাকে নিয়ে নীহার পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সমুদ্রে স্নান করতে নেমে অতলে তলিয়ে যায়। কিছুদিন পর জ্যোৎস্নারও দেখা দেয় হার্টের অসুখ। প্রায় বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যু হয়।

তখন সুদীনকুমার মিত্রের মনে পড়ে বছর তিনেক আগে নীহার চ্যাটার্জি নামে এক ভদ্রলোক একান্ত গোপনে তার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। দেখা হতে বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীর নাম জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না যখন অন্তঃসত্ত্বা হন সে সময় তাদের পরিবারে নীহার ও জ্যোৎস্না ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই নীহারের বাড়িতে রান্নাবান্না ও ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করার জন্য ঋতা তাদের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করে। ঋতা ছিল জ্যোৎস্নার মতোই সুন্দরী। সেই সময় এক রাতে নীহারের সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকতে শুরু করে। ডেলিভারির পর জ্যোৎস্না হাসপাতাল থেকে ফিরলে নীহার তাকে সব খুলে জানায়। ঋতাকে বিয়ে করার ব্যাপারে জ্যোৎস্নার সম্মতি চায়। জ্যোৎস্না নীহারের কাছে এজাতীয় নীচ প্রস্তাব স্বপ্নেও আশা করতে পারেনি। দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা হয়।

এর পরেই সুদীনকুমার মিত্রের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করেছিল, আমি জানি আপনি মহাশক্তিশালী তন্ত্রসাধক, আপনি সামান্য ইচ্ছা করলেই জ্যোৎস্নার মৃত্যু হবে। বলেই রাগে থর থর করে কাঁপছিলেন সুদীনকুমার। বলেছিলেন, মারণ, উচাটন, বশীকরণের কাজ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা করে। তারা কোনোদিনই তন্ত্রসাধক নয়। তারপর থেকে নীহার এবং তার পরিবার সম্বন্ধে কোনোরকমে খোঁজখবর রাখেননি সুদীন কুমার। ওইদিন সবটাই শোনেন ঋতার প্রেতাত্মার কাছ থেকে। তিন বছরে আগেকার পুরনো কথাগুলো বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকলো। সে রাতে দিঘার হোটেলের ঘরে পঞ্চমুণ্ডির আসন বিছিয়ে বসেন তিনি। ঋতার প্রেতাত্মার শান্তির জন্য সেই রাতেই আরম্ভ করেন ক্রিয়াকলাপ।

এইরকম অনেক কাহিনি রয়েছে সুদীনকুমার মিত্রের। যা অলৌকিক হলেও সত্য। তিনি নিজেই 'অবিশ্বাস্য সত্য' নামে দুই খণ্ডে দুটি বই লিখেছেন, যা এখন দুষ্প্রাপ্য। ভবানীপুরের নর্থ চক্রবেড়িয়া রোডে গড়ে তুলেছেন 'মাতৃ সঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম'। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'যা সত্য তা সব ক্ষেত্রে, সব সময় এবং সব মানুষের কাছেই সত্য। তারপরে সকলেই তাকে বিশ্বাস করেন এবং সত্য বলে গ্রহণ করেন। অথচ, আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য হলেও তা সম্পূর্ণ সত্য'।

যেমন, গ্রামের নাম আড়াইডাঙ্গা। গ্রামটা ছিল মালদা জেলার রতুয়া থানায়। মানিকচকের গঙ্গার ঘাটের খুব কাছে। একটা বড়ো রকমের আবগারি শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে সুদীনকুমারকে যেতে হয়েছিল সেই আড়াইডাঙ্গা। সেই পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মালদা থেকে রতুয়া পর্যন্ত বাসে যাওয়া যেত। তারপর পায়ে হেঁটে তামাকের ক্ষেতের আল ধরে ধরে। সুদীনকুমার গিয়েছিলেন অবশ্য সরকারি জিপে চড়েই। সঙ্গী সেপাই হাবিব। সঙ্গে বিছানা, সুটকেস আর পূজার বাক্স। গ্রীষ্মকালের আগুনে হাওয়ায় ফসল কাটা মাঠের উপর দিয়ে কোনোরকমে চলছিল জিপটা। কিছু দূরে দেখা যাচ্ছিল লোক বসতি। সেই সময় গ্রামের মানুষ গোরুর গাড়ি ছাড়া আর কোনো গাড়িই দেখেননি। ফলে জিপের শব্দ শুনে তারা অবাক হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছিল। আড়াইডাঙ্গা গ্রামটি মুসলমানপ্রধান। মেয়েদের শাড়ির ওপরে বোরখা। ১১-১২ বছর পর্যন্ত ছেলে-মেয়েরা কেউ জামা কাপড় পড়ে না। পুরুষদের সকলেরই এক মুখ চাপা দাড়ি। গলায় কালো কারে বাঁধা পিতলের তাবিজ। খালি গা, পরনে চেকচেক লুঙ্গি। মহম্মদ আলির বাড়িটা কোথায় জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল।

গোবর নিকানো দাওয়াটা পার হয়ে ভেতরে বিরাট উঠানে ঢুকতেই দেখলেন বাড়িটা খুব বড়ো। তার পিছনে অর্ধেকটা আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছিল একদিন আগে। মহম্মদ আলির প্রথমা স্ত্রী আমিনা বিবি পুড়ে মারা গেছে পেছনের দিকের ওই দোতলার ঘরে। তার পাশেই তামাকের গুদাম। অনুসন্ধানের কাজে এসেছে এক পুলিশ কনস্টেবল এবং রতুয়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর। আবগারি শুল্ক না দেওয়া প্রায় হাজার মন তামাক পুড়ে গেছিল বলে খবর পেয়েছিলেন সুদীনকুমার মিত্র। তন্ন তন্ন করে সবকিছু তদন্ত করে জানলেন হিসাবপত্রের খাতাও পুড়ে গেছে। মহম্মদ আলি এল। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর চেয়ার ছেড়ে সুদীনকুমারকে বসতে দিলেন। মহম্মদ আলিকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আনতে বললেন। উঠানের এক কোনে একটা ইঁদারা। ইঁদারার মুখটা অর্ধেকের ওপর কাঠ দিয়ে ঢাকা। মহম্মদ আলি সেখান থেকে জল আনতে যাচ্ছিল কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টর তাকে বাধা দিলেন এবং তাঁর ওয়াটার বোতল থেকে সুদীনকুমার মিত্রকে পানীয় জল দিলেন। ফিসফিস করে সাব-ইন্সপেক্টর জানিয়েছিলেন, ওই ইঁদারার জলে বিশ্রী দুর্গন্ধ। এবং যে ওই জল খায় সে মারা যায়। কিন্তু আগে গ্রামের লোকেরা গ্রীষ্মকালে ওই গভীর ইঁদারা থেকেই জল নিয়ে যেত। গ্রীষ্মকালে ওই অঞ্চলের সব পুষ্করিণি, ইঁদারা শুকিয়ে যায়।

আবগারি ইন্সপেক্টরের মনে সন্দেহ হচ্ছিলই, পিছনের দোতলাটায় আরও সকলে ছিল অথচ পুড়লো শুধু আমিনা বিবি, আর আবগারি গুদামটা। পিছনের দিকে অন্য দুটো ঘর তেমন পোড়েনি। গুদামের ভিতর কিছু পোড়া তামাকের সঙ্গে ছিল অনেক জল। আগুন নেভানোর জন্য জল ঢালা হয়ছিল। কিন্তু এক হাজার মন তামাকের পোড়া ছাই যে অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, মাত্র পনেরো-কুড়ি মন তামাকের আধ পোড়া অংশ ও পোড়া ছাই জলে ভিজে পড়ছিল। মনে সন্দেহ জেগেছিল, আগে থেকে গোপনে চক্রান্ত করে শুল্ক না দেওয়া তামাক অন্য কোথাও পাচার করা হয়েছিল বা বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত অংশে পোড়া তামাকের গন্ধকে ছাপিয়ে নাকের কাছে আসছিল একটা বিশ্রী গন্ধ। আবগারি ইন্সপেক্টরের মন সন্দেহের দোলায় দুলছিল। মহম্মদ আলি জানিয়েছিল, আশেপাশে ঘরে যারা ছিল তারা আগুন দেখে আগেই সেখান থেকে পালিয়ে ছিল। আমিনা বিবির কথা তখন তাদের কারও মনে পড়েনি। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর বলেছিলেন অগ্নিকাণ্ডটা একটু রহস্যজনক।

আমিনা বিবির দগ্ধ মৃতদেহের গলার টুটিটা ছিল কাটা। একেবারে ভস্মীভূত হয়ে গেছিল

শুধু তামাকের গুদামটা। পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর আমিনা বিবির দগ্ধদেহ কবর দেওয়ার হুকুম দিয়ে গেলে মহম্মদ আলি তার লোকজন নিয়ে মৃতদেহ সংস্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আশে পাশের গ্রামে তদন্ত করে বুঝতে দেরি হলো না, শুল্ক না দেওয়া তামাক আগেই পাচার করে দেওয়ার পর সামান্য তামাক-সহ গুদামটাকে স্বেচ্ছায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে আগুন আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজনিত নয়। তাছাড়া পাশের ঘরে মহম্মদ আলির প্রথমা পত্নী আমিনা বিবির আকস্মিক মৃত্যুটাও অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। রাত্রি আটটা নাগাদ মহম্মদ আলি একতলার দুটো ঘরে সুদীনকুমার মিত্রের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। একটা ঘরে দড়ির খাটিয়া বিছানা বিছিয়ে দিল সেপাই হাবিব। আর পাশের ঘরটায় থেকে গেল হাবিবের ড্রাইভার নরসিং। ঘরের ভেতরে ছিল একটা গুমোট আবহাওয়া। রাত্রি বারোটা নাগাদ নাকে এলো একটা বীভৎস গন্ধ। তারপরেই শুনতে পাওয়া গেল নারী কণ্ঠের একটা চাপা কান্নার সুর। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছিল জলের মধ্যে একটা ঝটপট শব্দ। টর্চ লাইট জ্বেলে খাটের তলার পুজোর বাক্স থেকে মন্ত্রপুত ত্রিশূল বের করলেন মাতৃসাধক। ত্রিশূলটা নিয়ে মশারির পাশে এসে দাঁড়ালেন। জানলার গারাদের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকল এক নারী মূর্তি। পায়ে তার বেশ বড়ো একটা লোহার বাটখারা শিকল দিয়ে বাঁধা। বাঁধা ছিল তার হাত দুটো। সারা শরীরের অনেক অংশই পচে গিয়েছিল। দুই চোখে তার বীভৎস চাউনি। যেন গিলে খেতে চাইছিল। ক্রমশ সেই নারীমূর্তি এগিয়ে আসছিল বাঁধা হাতদুটোকে বাড়িয়ে দিয়ে। ত্রিশূলটাকে উঁচু করে ধরতেই প্রেতাত্মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। মাতৃসাধক জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? কেন এখানে এসেছ?

নারীমূর্তি বলেছিল তার নাম, ফাতেমা। সে মহম্মদ আলির ছোটো ভাই সামাদের স্ত্রী। প্রবল শ্বাসকষ্টের সঙ্গে সে বলে চলেছিল, মাস তিনক আগে মহম্মদ আলি তার স্বামী সামাদকে পাঠিয়েছিল মানিকচক অঞ্চলের জমিজায়গা দেখার জন্য। সে শুনেছিল মহম্মদ আলির প্ররোচনায় এক চাষি সামাদকে সেখানে হত্যা করে গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সেই খবর আসার পরেই মহম্মদ আলি তাকে নিকাহ করে। তাকে নিয়ে অধিকাংশ সময় নীচের ঘরে কাটাত। দোতলায় তার প্রথমা পত্নী আমিনা থাকতো অন্যান্য নোকরানিদের সঙ্গে। আমিনা বিবির তার উপর ছিল প্রবল হিংসা। এবং সে একেবারেই পছন্দ করতো না মহম্মদ আলি তার সঙ্গে দিন-রাত কাটায়। মাস দুই আগে মহম্মদ আলির অনুপস্থিতিতে একদিন দুপুরে আমিনা বিবি দুজন নোকরানির সাহায্যে তার হাত পা দুটোকে শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। তারপর তিনজন মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে ওই ইঁদারার মধ্যে ফেলে দেয়। সে ভাবতেও পারেনি যে আমনা বিবি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে। ইঁদারর জলের তলায় অনেকক্ষণ ছটফট করেছিল। কিন্তু পায়ে এক মনি লোহার বাটখারা বাঁধা থাকায় সে কিছুতেই উপরে উঠতে পারেনি। বলে চলেছিল ফতেমা, আমিনা বিবিকে গতকাল আমি আমার কাছে টেনে নিয়েছি। কারণ, মহম্মদ আলিকে মারতে গিয়েছিল। কেননা, মহম্মদ আলি সন্দেহ করতো সে-ই আমাকে খুন করেছে। তখন মহম্মদ আলি তার গলার টুঁটি কেটে দোতলার ঘরে আগুনে ফেলে দিয়েছিল। তার তামাকও সেই সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলার সুযোগ পেয়েছিল। এর পরেই ফতেমা মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তন্ত্রসাধক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সেই ঘরটাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মশারিটায় দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেল। ত্রিশূলের একটা শূল দিয়ে জ্বলন্ত মশারিটাকে টেনে মেঝের ওপর নামিয়ে দিলেন। আর দেরি করলে বিছানায় আগুন লেগে যেত। এই সময় আবার নাকে এলো সেই তীব্র বিশ্রী গন্ধ। সামনে এসে দাঁড়াল এক বীভৎস নারীমূর্তি। সারাটা শরীর তার আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। আর গলার কাছে ছিল শুকনো কালো রক্তের এক গভীর চিহ্ন। তারও চোখে হিংস্র চাহনি। দাঁতে দাঁত ঘষছিল সে। বুঝতে দেরি হল না সে ছিল মহম্মদ আলির প্রথমা পত্নী আমিনা বিবি। ত্রিশূলটা উঁচু করে ধরে তাকে তৎক্ষণাৎ তার কবরস্থানে ফিরে যাওয়ার আদেশ করতেই মুহূর্তে আমিনা বিবি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

বিছানায় বসে মশার কামড়ের মধ্যে বাকি রাতটা কেটে যায় মাতৃসাধকের। সকালে আবগারি ইন্সপেক্টর খাতাপত্র পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, ওই গুদামে শুল্ক না দেওয়া তামাক ছিল এক হাজার মন। কিন্তু পোড়া বা আধপোড়া তামাকের ওজন কোনো কারণেই পনেরো মনের বেশি হতে পারে না। তৎক্ষণাৎ সুদীনকুমার মিত্র মহম্মদ আলিকে বলেছিলেন, প্রথমেই ওই ইঁদারার জল সেচে ফেলতে হবে, 'ইঁদারা'র তলটা আমি দেখতে চাই।

আধ ঘণ্টার মধ্যে মজুররা এসেই ইঁদারার জল সেচে ফেলল। চতুর্দিক ভরে গেল দুর্গন্ধে। ইঁদারার তলায় পাওয়া গেল এক নারী কঙ্কাল। তার দু' পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল একটা একমনি লোহার বাটখারা। মহম্মদ আলি স্বপ্নেও ভাবেনি ইঁদারার তলায় ফতেমার কঙ্কালটা এইভাবে পাওয়া যাবে। তার শরীর তখন থরথর করে কাঁপছিল। মাতৃসাধকের নির্দেশে সেই নারী কঙ্কালটাকে ইঁদারার তলা থেকে তুলে কবর দেওয়া হয়েছিল আগের দিন দেওয়া আমিনা বিবির কবরের পাশে। মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করে তার বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই সুদীনকুমার মিত্র বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন দানাপুর। লোকমুখে শুনে ছিলেন মহম্মদ আলির আকস্মিক মৃত্যু হয়। অলৌকিক ভাবেই প্রেতাত্মারা ধরিয়ে দিয়েছিল একখুনি এবং শুল্ক ফাঁকি দেওয়া প্রতারককে।

১৯১৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি সুদীনকুমার মিত্রের জন্ম হয়েছিল বিহারের ছোট্ট শহর গিরিডিতে। বাবা চন্দ্রকান্ত মিত্র এবং মা শ্রীমতী প্রমোদিনী মিত্রের তিনি ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। ছোটো থেকেই তাঁর নানারকম আধ্যাত্মিক সত্তার প্রকাশ পেতে থাকে। কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পর তিনি সরকারি অফিসার পদে যোগ দেন। এই সময়ে তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে তিনি মা কালী, আদ্যাশক্তি বা আদ্যামায়ের কাছে নিজেকে সঁপে দেন। তিনি তন্ত্র সাধনার দীক্ষা নেন নগেন বাবা বা নগেন্দ্রনাথ বাগচির কাছে। তিনি যখন যেখানে আবগারি সুপারেন্টেন্ড হিসেবে পোস্টিঙে থেকেছেন সেখানেই ছুটে গেছেন তাঁর কাছে অগণিত নর-নারী। যেখানে গেছেন সেখানেই তাঁর পুজোর বাক্সের সঙ্গে থাকত পঞ্চমুণ্ডির সিদ্ধাসন। সে গোরখপুর, দানাপুর, পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর, দার্জিলিং বা মালদা যেখানেই হোক। বহু মানুষের নানা সমস্যার সমাধান করেছেন তিনি। সারা পৃথিবী জুড়ে তার অসংখ্য শিষ্য শিষ্যা।

এই মাতৃসাধক দেহ রক্ষা করেন তার জন্ম তারিখ ১৮ ফেব্রুয়ারিতেই। সালটা ১৯৮৪। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৬৪। ▮

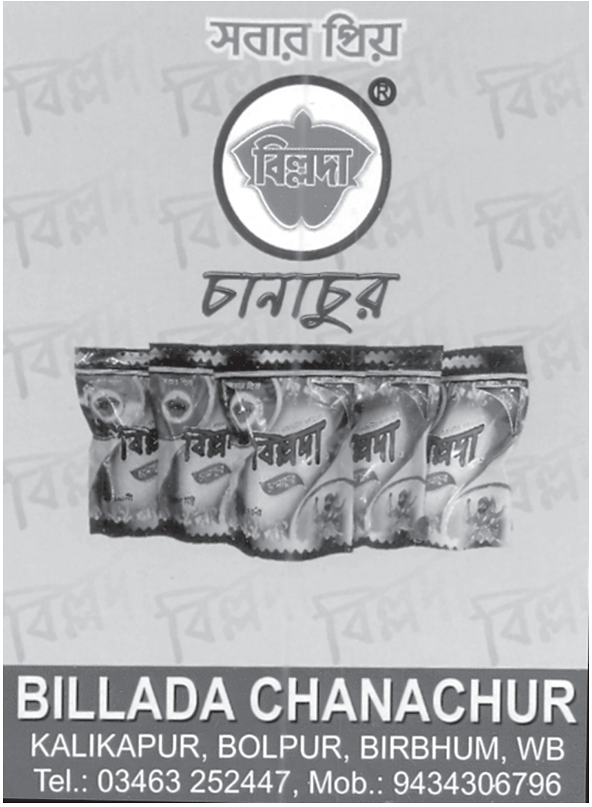

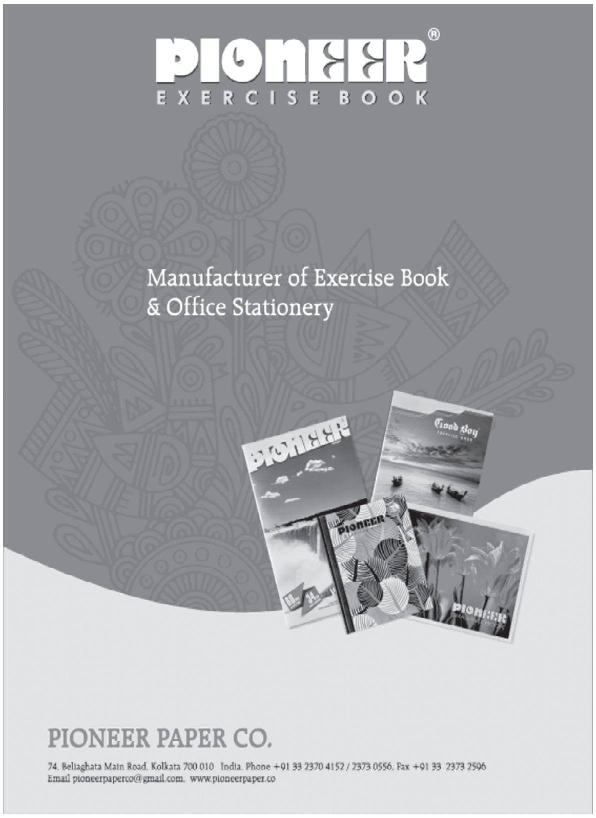

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সৃষ্টির দেবী কালিকা ন্যায়েরও দেবী

সুজিত রায়

ভারতের বৈদিক ভাষ্যে সৃষ্টিরহস্যের একটি বিশ্লেষণ রয়েছে ঋকবেদের দশম মণ্ডলে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সেখানে একটি স্তোত্র রয়েছে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষাবিদ এবং ভারততত্ত্ববিদ ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলার সেই সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত স্তোত্রটির নামকরণ করেছিলেন 'সৃষ্টির সংগীত— The hymn of creation। সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্তোত্রটির বাংলায় রূপান্তরিত রূপটি হলো :

'আদিতে না ছিল অস্তিত্ব, না অনস্তিত্ব
ছিল না বায়ু সাম্রাজ্য, ছিল না বহির্দিগন্ত।...
ছিল কি জলরাশি, অপরিমেয় জলরাশি?
ছিল না মৃত্যু এবং মৃত্যু হীনতাও,
ছিল না উত্তেজনা সৃষ্টির কোনও উৎস,
দিবা অথবা রাত্রির কোনো যবনিকা।...
ছিল একমাত্র তমসা, অন্ধকারের গভীরে অন্ধকার,
অস্থিরতা অবিচ্ছেদ্য তমিস্রা, নিরাকার শূন্যতা।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই নিরাকার শূন্যতাকেই প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় 'Chaos' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রিক শব্দ 'Chaos'-এর আক্ষরিক অর্থ অসীম শূন্যতা। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বিশ্বাস করা হতো, সৃষ্টির প্রারম্ভে শুরুর আগে না ছিল সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র। গোটা ব্রহ্মাণ্ড জুড়েই চলছিল অস্থিরতা। অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের চরম সংকট তখন। সেই পরিস্থিতি থেকেই—

আবিভূর্ত হলেন তাপস,
বিশাল অগ্নিখণ্ড থেকে নির্মিত হলো ব্রহ্মাণ্ড
উদ্রেক হলো কামনার, অনভিলাষী কামনা,
প্রথম বীজ, আত্মার প্রথম অঙ্কুর।'

গ্রিক পুরাণে বলা হয়েছে প্রথম আবির্ভাব হয় গায়িয়ার। গায়িয়ার অর্থ হলো ধরিত্রী। তারপর এল উরানস বা উরেনস যার অর্থ হলো আকাশ।

ধরিত্রী নারী।
আকাশ পুরুষরূপী দেবতা।

উত্তর আমেরিকার কাটো উপজাতিদের মধ্যে 'সৃষ্টি-১' নামে একটি গান প্রচলিত আছে। গানটির বাংলায় অনুবাদ অনেকটা এরকম :

'জলরাশি প্রস্থান করেছিল, তারা বলে।
ভূমি ছিল না, তারা বলে।
জল একমাত্র যখন, পর্বতরাজি ছিল না, তারা বলে।
নেকড়েরা ছিল না, তারা বলে।
তখন বাতাস ছিল না, তারা বলে।
তখন বৃষ্টি ছিল না, তারা বলে।
তখন বৃষ্টিপাত হয়নি, তারা বলে।
বিদ্যুৎ জ্বলেনি, তারা বলে।

তখন মেঘ ছিল না, তারা বলে।
তারকা ছিল না, তারা বলে।
ছিল শুধু গভীর অন্ধকার।'

এ-ও তো Chaos অর্থাৎ চরম বিশৃঙ্খলা।

এই বিশৃঙ্খলাই কি ছিল ভারতীয় পুরাণ ও সনাতনী শাস্ত্রে উল্লেখিত শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই দৈত্যের সৃষ্ট ভয়ংকর ত্রাস? যাদের অত্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ইন্দ্রলোকের দেবতারাও?

মহামায়া কালিকা দেবীর আবির্ভাব লগ্নের কাহিনিটা এমনই। সেই তমসাঘন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উষালগ্নে এই দুই দৈত্যের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলায় 'ত্রাহি ত্রাহি' রব তুলে দেবতারা ত্যাগ করেছিলেন ইন্দ্রলোক। দেবরাজ ইন্দ্র তখন দেবলোক ফিরে পাওয়ার আকুতি নিয়ে আদ্যাশক্তি মা পার্বতীর তপস্যা শুরু করলেন। ইন্দ্রের তপস্যায় তুষ্ট হলেন দেবী। আবির্ভূত হলেন দেবতাদের সম্মুখে। তাঁর শরীরের কোষ থেকে সৃষ্টি করলেন এক নবীনা দেবীর। দেবী কৌশিকী। মহামায়ার দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করলেন দেবী কৌশিকী। সেটাই ছিল কালীমায়ের আদিরূপ।

'কালী' শব্দটির উৎপত্তি 'কাল' শব্দ থেকে। অর্থাৎ মহাকাল। যার বর্ণ ঘোর তমিস্রার মতো অন্ধকার। কাল শব্দেরই স্ত্রীরূপ হলো কালী। মহাভারতে বলা হয়েছে, কালী মহামায়া দুর্গারই একটি রূপ। আবার হরিবংশ গ্রন্থের মতে কালী একটি দানবীর নাম। মহাভারতে এক দেবীর উল্লেখ আছে যিনি যুদ্ধকালে হত যোদ্ধা ও পশুদের আত্মা বহন করেন। সেই দেবীর নাম কালরাত্রি বা কালী। কালী বা কালিকা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপাস্য। তিনি তাদের কাছে শক্তির দেবী। তন্ত্রশাস্ত্রে তিনিই আবার দশমহাবিদ্যা নামে পূজিত প্রধান দশ দেবীর প্রথমা।

শাক্তরা মনে করেন, কালীই হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিকারণ। তাঁর চার হাতে তাই রয়েছে খড়্গ, অসুরের ছিন্নমুণ্ড, অভয়মুদ্রা আর কণ্ঠে দোদুল্যমান মুণ্ডমালা। গায়ের রং নিকষ কালো। এলোকেশী। জিহ্বা প্রকাশমান। নগ্ন কালিকা দণ্ডায়মান তাঁরই স্বামী শিবের বুকের ওপর। এই রূপ ভয়ংকর সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশৃঙ্খলার আঘাতে উথাল পাথাল ব্রহ্মাণ্ডকে নিস্তরঙ্গ করার জন্য দেবীর এই মূর্তি ধারণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই কালিকা হলেন সৃষ্টির আদিমানবী। অন্ধকার থেকে আলোয় ব্রহ্মাণ্ডকে উৎসারিত করার দেবী— নারীশক্তি আদ্যা মা।

তন্ত্র ও পুরাণে দেবী কালীর একাধিক রূপভেদের পরিচয় মেলে। তোড়লতন্ত্র মতে কালী অষ্টধা বা অষ্টবিধ। এর রূপগুলি হলো : দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, চামুণ্ডা, সিদ্ধকালী। মহাকাল সংহিতা মতে কালী নব রূপা। কালকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালী ও চণ্ডিকালী এই নবরূপেরই চার রূপ। বাকি রূপগুলি হলো : দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, সিদ্ধিকালী ও গুহ্যকালী। আবার কোথাও তিনি ব্রহ্মময়ী, কোথাও ভবতারিণী। কোথাও করুণাময়ী, কোথাও আনন্দময়ী।

কিন্তু বাঙ্গলায় কালীপুজোর প্রচলন হলো কবে ও কোথায়? বিতর্ক থাকলেও বিশিষ্ট গবেষক ড. শশীভূষণ দাশগুপ্তের মতে, ১৭৬৮ সালের আগে কালীপুজোর তেমন কোনো সন্ধান মেলে না। এ বছরেই রচিত কাশীনাথ-এর 'শ্যামাসপর্যা বিধি' গ্রন্থে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপুজোর বিধান পাওয়া যায়।

বহু গবেষক আবার বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকেই বাঙ্গলায় কালীপুজোর প্রবর্তক বলে সম্মান জানিয়েছেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেন। আগামবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলার সাধক সমাজ অনেকদিন বলেন নাই; লোকে আগমবাগিশী কালী বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।' তবে কালীপূজাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন নদীয়া-রাজ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁর রাজসভার সম্মাননীয় সভাসদ প্রসিদ্ধ কালীসাধক ও কালীসংগীত রচয়িতা শ্রীরামপ্রসাদ সেন অবশ্য আগমবাগিশী মতেই কালীপূজা করতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র কালীপূজাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন।

বর্তমানে মধ্যরাতে তন্ত্র-পদ্ধতিতে কালীপূজা করা হয়। দেবীকে ছিন্নমস্তক-সহ বলির পশুর রক্ত, অন্ন, লুচি, মাছ-মাংস ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করা হয়। তবে গৃহস্থবাড়িতে কালীপূজা হয় ব্রাহ্মণ্যমতে। তন্ত্রমতে নয়। অতীতে নরবলির প্রচলন থাকলেও বর্তমানে তা বিস্মৃত। এখন কোথাও কোথাও ছাগবলি হলেও বেশিরভাগ পুজোয় চালকুমড়া বা শশাজাতীয় ফলাদি বলি দেওয়া হয়।

অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসার গ্রন্থদ্বয়ে কালীর তেরো রূপের উল্লেখ করেছেন— সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, মার্তণ্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী, মহাভৈরবঘোর ও চণ্ডকালী।

জয়দ্রথ যামল গ্রন্থে দশ রূপের উল্লেখ রয়েছে— ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালিকা, ধনদকালিকা, রমণীকালিকা, ঈশানকালিকা, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তাকালী।

বহুবিধ নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে দেবীর বাহ্যিক রূপও। কোথাও তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণা, কোথাও শ্যামবর্ণা। কোথাও তাঁর ছাইরং, কোথাও শ্যামবর্ণা।

সামগ্রিকভাবে তিনি করালবদনা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা ও মুণ্ডমালা ভূষিতা। তাঁর বামকরযুগলে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড ও খড়্গ, দক্ষিণকরযুগলে বর ও অভয়মুদ্রা। তাঁর গাত্রবর্ণ ঘন মেঘের মতো। তিনি দিগম্বরী। কটিদেশে নরহস্তের কটিবাস। গলায় মুণ্ডমালা। কর্ণে শবরূপী কর্ণাবতংস। তাঁর দন্তবিকশিত। স্তনযুগল উন্নত। ত্রিনয়নী। মহাভীমা। হাস্যযুক্তা ও রক্তপানকারিণী।

রূপে রূপে রূপান্তরিতা মহাশক্তি আদ্যাশক্তি কালিকা সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্রী। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে তিনি শুভশক্তির সূচনা করেন। তাই দেবী কালী মাতৃময়ী শুভদায়ী। তাই দীপাবলির আলোয় তিনি বিজিতার মতো সজ্জিতা। তিনি ঘোরতর মসীকৃষ্ণ হলেও তিনিই আলোর সন্ধানদাত্রী। তিনিই বিশ্বকে অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ করেন। তাই তিনি আলোকময়ী।

আজ যখন গোটা বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরপুর, যখন মানুষের জীবন ও জীবিকা অন্ধকারে নিমজ্জিত, যখন সামাজিক সাধারণ নিয়মাবলীও ভূপতিত, যখন চারিদিকে দুর্নীতির অন্ধকার তখনই দেবী কালিকাকে স্মরণ করার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ভয়াবহ প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং মনুষ্যবিরোধী যাবতীয় আইনকানুনের কড়া ফাঁসে মানুষ শ্বাসরুদ্ধ। এই সময় দেবী কালিকার প্রয়োজন।

কালীপূজা হয়ে উঠুক এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে ন্যায়ের উৎসব। রাজনীতির নয়। হয়ে উঠুক প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের দীপাবলী। ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতের বেড়া ঠেলে প্রতিষ্ঠিত হোক মানবধর্ম। মানবধর্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হোক গোটা বিশ্বের মনুষ্যসমাজ। আসুন, আমরা সকলে মিলে শপথ নিই— দেবী কালিকার বরাভয়ে বলিয়ান হয়ে আমরা এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তুলি— যেখানে 'অন্যায়' শব্দটির কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। ■

মহাকালকে কলন করেন বলে তিনি কালী

গোপাল চক্রবর্তী

কালী নামটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মুণ্ডক উপনিষদে। এখানে কালীকে অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক জিহ্বারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দেবী কালী এখানে লেলিহান অগ্নিশিখা। আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেখি, দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য অসুর বিনাশার্থে দেবী পার্বতীকে 'কালী' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। দশ মহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা 'কালী'। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের লঙ্কার রক্ষয়িত্রী চামুণ্ডাদেবীর রূপের সঙ্গে কালীমূর্তির অপূর্ব মিল। মহাভারতে ভীমের অনার্যা স্ত্রী ঘটোৎকচ-জননী হিড়িম্বার আরাধ্যা দেবী কালীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তার থেকে মনে হয় কালী অনার্যদেরও দেবী ছিলেন। বিশ্বের নানাদেশে নানা ধর্মে কালীদেবী পূজিতা। জাপানে পূজিতা 'চঙ্গোস্টী' —কালীর চণ্ডীরূপের নামান্তর। বৌদ্ধতন্ত্রে কালীর নাম মারতারা। মগ, চাকমা প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী উপজাতিদের আরাধ্যা 'মারতারা' কালীর আরেক রূপ। চীন দেশে কালীর নাম 'তিয়েন হো সিন মু' কলকাতার চীনারাও এই নামে কালীপূজা করেন। মা কালীর প্রিয় ফুল জবা আসলে চীন দেশের ফুলের ইংরেজি নাম 'চায়না রোজ'। 'চো-লি চীনা শব্দটির অর্থ লাল কাপড়। লাল চেলি কালী পূজার অন্যতম উপাচার। কালী পূজায় যে বাজি পোড়ানো হয় তার উৎপত্তিও চীন দেশে। আমাদের পরিচিত যে কালীমূর্তি তার প্রথম রূপদ্রষ্টা নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। রাতে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি পরদিন প্রভাতে দর্শন করলেন এক কৃষ্ণবর্ণা 'উপজাতি কন্যাকে। সেই রূপকেই স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মা-কালীর রূপে রূপায়িত করলেন আগমবাগীশ, রূপকের সঙ্গে মনের মাধুরীর সমন্বয়ে। সেই মূর্তিই আমাদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার কালীমূর্তি। কালীমূর্তির রূপকের বিশ্লেষণ সাধকেরা যুগে যুগে নানা ভাবে করে এসেছেন।

কৃষ্ণবর্ণা বলেই কালী :

কৃষ্ণবর্ণা বলেই দেবী কালী নামে খ্যাতা। ধ্যানে তাঁকে 'নীলোৎপলশ্যামা' বলা হয়েছে। কামাখ্যাতন্ত্রে আছে— 'কৃষ্ণাবর্ণা সদাকালী আগস্যেতি নির্ণয়।' মহানির্বাণ তন্ত্রে বলা হয়েছে, শ্বেতপীতাদি বর্ণ যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি সর্বভূত কালীর মধ্যে প্রবেশ করে, অর্থাৎ বিলীন হয়ে যায়। এই জন্য যাঁরা মোক্ষের উপায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁরা নির্গুণ নিরাকার কল্যাণময়ী কালশক্তির কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করেছেন—

শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্বভূতানি শৈলজে।।
অতস্তস্যাঃ কালশক্তে নির্গুণায়া নিরাকৃতে।

হিতায়ঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণোনিরুপিতঃ।।

পরাশক্তি অরূপ, সুতরাং বর্ণহীন। যেখানে সর্ববর্ণের অভাব তাই তা নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ —একথা বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান আরও বলে, যে জ্যোতিঃ আমাদের চক্ষু ধারণা করতে পারে না তাই নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। তাই মহাজ্যোতি স্বরূপা কালী কৃষ্ণবর্ণা। আবার জ্ঞাননেত্রে মহাজ্যোতির রূপে দৃশ্য হন। দেবীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বরূপ আমাদের শাসনে উদ্ভাসিত হয়।

'ওঁ কালী করালবদনা, বিনিস্ক্রান্তা সিপাসিনী।
বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধরা মুণ্ডমালা বিভূষণা।।
দ্বীপিচর্ম পরিধানা শুষ্কনাংসাতিভৈরবা।
অতি বিস্তারবদনা জিহবা ললন, ভীষণা।।
নিমগ্না রক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা।।

কালী করালবদনা :

কালী বা মহাকালী অষ্টরূপে সাধকের ধ্যেয়। কালের করালগ্রাসে সব কিছুকেই লয় হতে হয়। মহাকাল সৃষ্টি থেকে চিরকাল সবকিছু লয় বা গ্রাস করেন। সেই কারণেই তিনি জগৎ সংহারক মহাকাল নামে কীর্তিত। প্রলয়কালে সেই মহাকালকেও যিনি 'কলন' বা গ্রাস করেন, তিনি করালবদনা কালী। জগৎ সংসারে যখন অশুভ আসুরিক শক্তির তাণ্ডব শুরু হয় তখন দুষ্কৃতীর দমন এবং শিষ্ট সাধুজনের পরিত্রাণের জন্য করালবদনা মহাকালীর আবির্ভাব।

কালী মুক্তকেশী :

কালী মায়াতীতা, কিন্তু জীবলোককে মায়াপাশে বদ্ধ করেন। তাঁর ঘন কৃষ্ণ মুক্ত কেশজাল মায়াপাশের প্রতীক। আবার মহাকালী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মুক্তি বিধান করেন তাই তিনি মুক্তাকেশী।

নিরুত্তর তন্ত্রে আছে—
মহাকল্পতরু কালী অনিরুদ্ধসরস্বতী।
ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশানাং ভুক্তিমুক্তেককারণম্।।

কালী ত্রিনয়না :

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই সেই ত্রিগুণাময়ী, ত্রিকালদর্শী মায়ের নয়নপথে সর্বদা প্রতিভাত হয়েছে। ধ্যানান্তরে দেখতে পাওয়া যায়—

বহ্ন্যর্ক কালীনেত্রঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতানত্রাং

মায়ের নয়নত্রয়ে বিশ্বের তেজ বা অগ্নি, সূর্য ও চন্দ্ররূপী তিনটি নয়ন সর্বক্ষণ উদ্ভাসিত রয়েছে। তা যথাক্রমে বিশ্বের তেজঃ বা দীপ্তিতে— প্রথম, জ্যোতিঃ বা প্রকাশে দ্বিতীয়, এবং শান্তি বা রূপে তৃতীয় ভাব প্রকাশ করছে। আলো, তেজ, উষ্ণতা দিয়ে মায়ের ত্রিনয়ন যেমন বিশ্বকে পূর্ণতা দিচ্ছে আবার স্নিগ্ধ শান্ত জ্যোতি জগৎকে করুণা ধারায় স্নাত করাছে। অপরদিকে মায়ের রক্তনয়ন দুর্বিনীতদের শাসন করছে, ভয় দেখাচ্ছে। এইতো মায়ের ত্রিনয়নের তাৎপর্য।

দেবী মুণ্ডমালিনী :

মা কালীর গলায় পঞ্চাশ অসুরমুণ্ডের মালা। রজোভাব তিরোহিত, অসুরভাব বর্জিত, শুদ্ধ মস্তিষ্ককে দৈবীসম্পদে পরিণত করে মা মালারূপে গলায় ধারণ করেছেন। আবার তন্ত্র মালারূপে গলায় ধারণ করেছেন। তন্ত্র বলছে— 'পঞ্চাশৎ বর্ণমুণ্ডালী'। শব্দ ছাড়া অর্থের প্রকাশ হয় না। শব্দের সার স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলে ৫০টি বর্ণের মালা দেবীর গলায় শোভিত।

দেবী কালী দিগম্বরী :

কালী দিগম্বরী বা দিগ্‌বসনা। সবচেয়ে সূক্ষ্মী আবরণ মায়া। কালী পূর্ণব্রহ্মময়ী বলে মায়াতীতা। তাই তিনি আবরণশূন্যা, দিগম্বরী। মা মহামায়া আসক্তিহীন, মায়ামোহরহিত, সর্বত্যাগের প্রতীক। এই দিগম্বরী কালীমূর্তি নিয়ে লজ্জা কিংবা সমালোচনার অবকাশ নেই। গ্রিকদেবী ম্যাডোনার লক্ষ লক্ষ নগ্নমূর্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং উৎকৃষ্ট শিল্পসুষমামণ্ডিত বলে উচ্চ প্রশংসিত। রোমের ভ্যাটিকান সিটিতে পোপের গির্জা সিস্টাইন চ্যাপেলে মাইকেল এঞ্জেলো অঙ্কিত লাস্ট জাজমেন্ট নামক ছবিতে শিশুর নগ্ন চিত্র জগদ্‌বন্দিত। দেবীর এই নগ্নরূপের আরেকটি তাৎপর্য হলো, দেবী সংহারকর্ত্রী, জীবনের অন্তিম দিনের প্রতীক। দিগম্বরী দেবী মানুষকে এই শিক্ষা দিয়েছেন লোভ, মোহ ত্যাগ করো। লোভ মোহের বশবর্তী হয়ে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাও, বৃদ্ধ অথর্ব বাবা-মা-কে তোমার ভোগ সুখের অন্তরায় বলে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাও— চেয়ে দেখ, তোমার শেষ দিনের ছবি, একটা সুতোও তোমার সঙ্গে যাবে না। তোমার আগুনে পোড়া কৃষ্ণদেহ, চারদিকে মৃতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। শবদেহ, ভূত-প্রেত, শেয়াল যেন এক চলমান জীবন্ত শশ্মান। অতএব হে উদ্ধত জীব সতর্ক হও।

কালীর চতুর্ভুজ মাহাত্ম্য :

কালী চতুর্ভুজা, দেবী চার হাতে সাধক ভক্তজনদের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ— এই চতুর্বর্গ দান করেন। দেবীর বাম ঊর্ধ্বহস্তের খড়্গ নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছিন্ন করে। বাম নিম্ন হস্তে নৃমুণ্ড তত্ত্বজ্ঞানের আধার। দেবী নিরাসক্ত ভক্তজনকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। দেবীর ডান ঊর্ধ্বহস্তে অভয় মুদ্রা এবং নিম্নহস্তে বরমুদ্রা সকাম সাধককে অভয় এবং অভিষ্ট বর প্রদান করেন।

দেবী পীনোন্নত পয়োধরা :

জগজ্জননী কালী পীনোন্নত পয়োধরা। এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব জগৎপালনকর্ত্রী দেবী কালী স্তন্যরূপ অন্ন-জলধি দ্বারা ত্রিজগৎ পরিপালন করছেন।

শবহস্তকৃত কাঞ্চী :

কালীর কটিদেশে শবহস্তে নির্মিত কাঞ্চী। হস্ত মানুষের প্রধান কর্মসাধন। অর্থাৎ কাজ করার যন্ত্র। তাই হাতকে কর্মের প্রতীক বলা যায়। এই হস্ত সমূহের দ্বারা নির্মিত কাঞ্চী কটিদেশে ধারণ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ম শক্তিকে দেবী নিয়ন্ত্রণ করছেন।

কালীমূর্তি শিববক্ষস্থিতা :

কালী শবরূপী শিবের বক্ষোপরি অবস্থিতা। শব নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতীক। সেই জন্য সেই শক্তিকে লীলার উপলক্ষ্য স্বরূপ নিম্নে রেখে মুক্তিদাত্রী মহাশক্তি তাঁর উপরিভাগে আরূঢ়া। নিশ্চেষ্ট পুরুষ বা সৃষ্টিশক্তিতে পদতলে স্তম্ভিত করে দেবী মুক্তির বিজয় ঘোষণা করেছেন। প্রলয়কালে মহামায়া যখন বিশ্বের সমস্ত চৈতন্যশক্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিসংহার করে অব্যক্ত তত্ত্বে বিলীন হয়ে যান তখন জগৎ শিব বা শব হয়ে যায়। কালীমূর্তি এই সংহারতত্ত্বেরই প্রতীক।

কালীপূজা আর কালীমূর্তি ভারতীয় সংহতির মূর্ত প্রতীক। অনাদিকাল থেকে ভারতবর্ষে নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়েছে কালীপূজা আর কালীমূর্তি। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আরাধ্যা দেবী ছিলেন মা কালী। ■

শক্তি সাধনার ভূমি এই বঙ্গদেশ

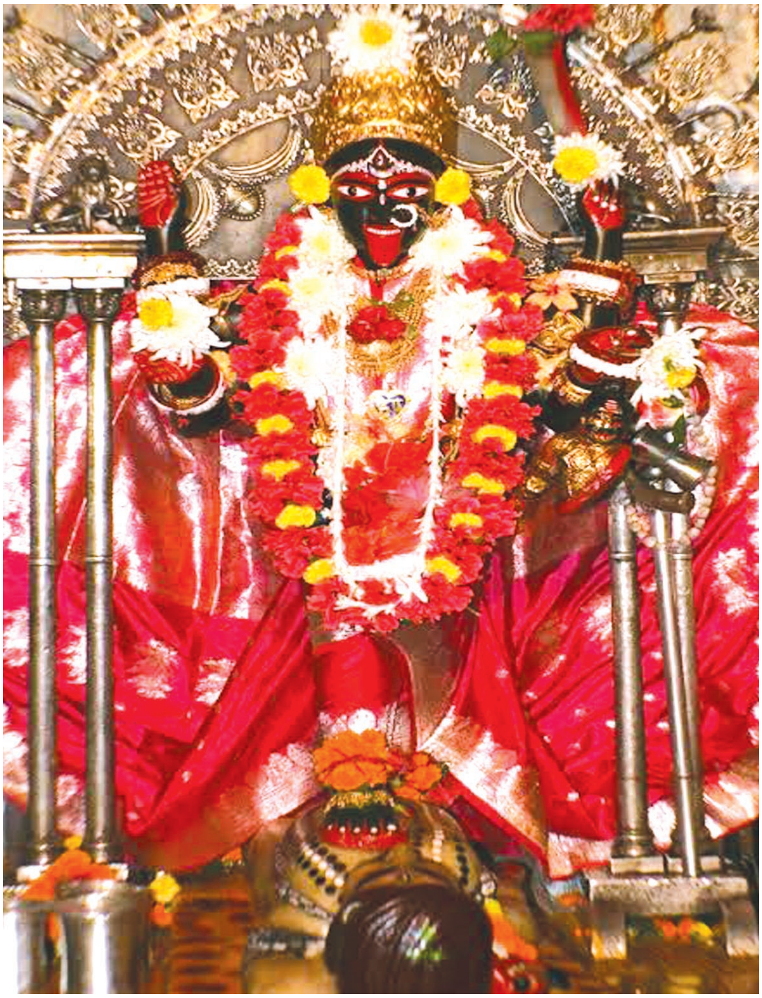

কল্যাণ গৌতম

১৮৯৮ সালের আগস্ট মাস, স্বামীজী কাশ্মীরের জাগ্রত দেবীস্থান ক্ষীরভবানী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে দেখলেন মন্দিরের নিদারুণ ভগ্নদশা। মনে তীব্র ক্রোধ আর হতাশা জন্ম নিল, মনে মনে প্রবল বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন মন্দির ধ্বংসকারী মুসলমানদের উপর। 'যবনেরা এসে তাঁর মন্দির ধ্বংস করে গেল, তবু এখানকার লোকগুলি কিছুই করল না। আমি যদি তখন থাকতাম, তবে কখনো চুপ করে সে দৃশ্য দেখতে পারতাম না।' পরধর্মীদের আগ্রাসনে অন্য ধর্মীয় নেতার মনে যেমন ক্রোধের উদয় হয়, তেমনই হলো স্বামীজীর। তারপরই শুনলেন সেই দৈববাণী, 'আমার ইচ্ছা আমি ভাঙা মন্দিরে বাস করব। ইচ্ছা করলে আমি কি এখনই এখানে সাততলা সোনার মন্দির তুলতে পারি না? তুই কি করতে পারিস?'

তিনি মহাকালের উপরই সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলেন সমস্ত দায়ভার, তুরীয় অবস্থায় তাঁর উপর মহাশক্তি ভর করল। কিন্তু সুদূরের সলতে পাকানোর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। লিখলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Kali the Mother', যার পরতে পরতে মহাকালীর তাণ্ডব প্রগাঢ় মানসিক অভিভবে ধ্বংসলীলা। আপন বোধকে লক্ষ-কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তিনি। কবিতাটি ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে এক আবশ্যিক পাঠ হয়ে দাঁড়ালো। আর সেই স্বাধীনতা সংগ্রামও হয়ে দাঁড়ালো হিন্দু জাতীয়তাবাদ। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে নবজাগরণের ফলে বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী সুপ্তিদশা থেকে জেগে উঠেছিলেন, তা আদতে ছিল হিন্দু নবজাগরণ; তার মধ্যে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের মতো মহান মনীষার কেউই বাদ ছিলেন না।

স্বামীজীর 'কালী দ্য মাদার' কবিতার মধ্যে রয়েছে তাঁর ভাব-শিষ্যদের প্রতি শক্তি-সাধনার আহ্বান, যার ধারাপাত ক্ষীরভবানী মন্দিরকেও লাঞ্ছনা মুক্ত করতে পারে, পারে ভারতীয় উপমহাদেশে ছড়ানো ছিটানো অনেকানেক দেবালয়ের লাঞ্ছনা মুক্তি। সে কাজ স্বামীজীর একলার পক্ষে সম্ভব নয়; অনেক স্বামীজীর জন্ম দিতে হয়। স্বামীজী তখন ক্লান্ত, অসুস্থ, সনাতনী ধর্মের প্রচার ও প্রসারে জীবনী-শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছেন। তাই কাব্যের মোড়কে স্পষ্টই বার্তা দিলেন আগামী প্রজন্মের প্রতি। দীপ হাতে হাজির হলেন শ্রীঅরবিন্দ; লিখলেন 'ভাবনী-ভারতী'। 'শ্যামা জননীর মহাপ্রসাদ' শ্যামাপ্রসাদের বলিদান হলো কাশ্মীরে। তারই ধারাবাহিকতায় স্বামীজীর ১২০ বছর বাদে আর এক নরেন্দ্রর হাতে দীপাধার পৌঁছলো। অমিতবিক্রমে জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিতর্কিত অস্থায়ী ধারা বিলোপ করে সেই কর্তব্যেরই অখণ্ড ধারাবাহিকতা সারলেন তিনি। সেই ধারার কাজ এখনও চলছে। কেবল কাশ্মীরের ইতিহাসই বদল হচ্ছে না, বদল হচ্ছে তার ভূগোলও। এ এক অমিত-অভ্যুত্থান, অমিত-বিক্রম। অতীতের ভুলের পাহাড়কে সরানোর কাজ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শাক্ত কবিতা মৃত্যুরূপা মাতা, Kali the Mother কবিতা, 'Who dares misery love,/And hug the rorm of Death,/Dance in Destruction's dance,/To him the Mother comes.' (সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে)। এ যে ভয়ংকরের পুজো, মৃত্যুর পুজো, এ যে কাপুরুষের আত্মহত্যা নয়,

ফ ঃ ৪

এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! এক এক করে স্বামীজী লিখে চলেছেন মৃত্যুরূপা কালীকে নিয়ে; 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'My play is done', 'Who knows how Mother plays'। ঠিকই তো! জগজ্জননীর অনন্তলীলার কে কবে তল পেয়েছে? 'কে বা সে পামর দুঃখে যার ভালোবাসা?' হৃদয়কে শ্মশান করে তুলে, স্বার্থ-সাধ-মানকে চূর্ণ করে সেখানে নাচাতে চান শ্যামা-মাকে! মৃত্যু, অন্ধকার, সংগ্রাম ও দুঃখচেতনার এই অন্তর্নিহিতি জারিত করেছিল ভগিনী নিবেদিতাকে।

নিবেদিতা ১৮৯৯ সালের নভেম্বরে পাশ্চাত্যে যাত্রাকালে স্বামীজীর কাছ থেকে গভীরভাবে জেনে নিলেন কালী-দর্শন। তিনিও লিখলেন গ্রন্থ, 'Kali the Mother'; এ যেন মনোময়ী কালী, একেবারেই নিবেদিতার নিজস্বতার ছোঁয়া। তার আগে স্বামীজী তাঁকে দিয়ে বঙ্গদেশে কালীতত্ত্ব প্রচার করিয়ে নিয়েছেন। ১৮৯৮ সালের ১১ মার্চ কলকাতার স্টার থিয়েটারে নিবেদিতা বক্তা, ১৮৯৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি অ্যালবার্ট হলে ও ১৮৯৯ সালের ২৮ মে কালীঘাট মন্দিরেও নিবেদিতার ভাষণ। নিবেদিতার নিজের উপর বিশ্বাস তখন পুরোদমে। এই কালী ভাবনার মধ্যে ফুটে উঠছে মানুষের মনের শক্তির আলোড়নের প্রতিচ্ছবি, কালী-সদাশিবের তত্ত্ব। নিবেদিতা লিখতে পেরেছেন এই জন্যই ততদিনে তাঁর খ্রিস্টীয় সংস্কারের ওপরে কালীর কৃষ্ণছায়াপাতের সূচনা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্যের পরত সরে যাচ্ছে, কোনো লাস্যময়ীর লীলাচাতুরির হালকা ওড়নার ঢাকা সরে যাচ্ছে। যে শিবকালী সাধনাকে জাতি-গঠনের কাজে লাগানোর কথা বলছেন স্বামীজী, সেই শিব-কালীকেই ভারতের চৈতন্য হিসাবে রূপায়িত করলেন নিবেদিতা। ভয়ংকরী কালী যেন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ নারীর ভয়ংকর বাসনা!

ভারতমাতার এক স্বরূপ হচ্ছেন মহাকালী। যিনি ব্রহ্মময়ী, তিনিই দেশমাতৃকা, তিনিই ভারতমাতা। তাই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির ছিল বিপ্লবীদের এক মহাশক্তির আধার। রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এই ত্রয়ী ছিলেন মহাবিপ্লবের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিরঞ্জিত মৃত্তিকা বিপ্লবীদের কাছে ছিল এক tremendous explosive material। শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'মনে রাখিস ইংরেজরাই এদেশের সর্বনাশ করছে।' স্বামীজী বলেছিলেন আগামী পঞ্চাশ বছর ভারতমাতাই ভারতবাসীর একমাত্র উপাস্য দেবতা। নিবেদিতার আদর্শে ভারতমাতার ছবি আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ। অখণ্ড ভারতবর্ষের সাধনায় ব্রতী হলেন অরবিন্দ। ডি.এল. রায় লিখলেন, 'চল সমরে দিব জীবন ঢালি—/ জয় মা কালী!'

পুলিশের নজরও ছিল মঠ মিশন ও তার শাখাকেন্দ্রগুলিতে, ছিল জয়রামবাটিতে মায়ের ভিটেতে। মা সারদার ধারণা ছিল, নরেন বেঁচে থাকলে 'কোম্পানি' তাকে জেলে ভরে রাখত। ১৯০৮ সালের ২ মে মানিকতলা বোমা মামলার অন্যতম আসামিকে ৪৮নং গ্রে স্ট্রিটের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ সুপার ক্রেগান সাহেব অরবিন্দের শিয়রের কাছ থেকে আবিষ্কার করেছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মাটিপূর্ণ একটি পাত্র। অগ্নিযুগের বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, তার রক্তে যে চির বিপ্লবের নেশা, তা স্বামীজীর স্পর্শে সঞ্জীবিত। স্বামীজী এই শক্তি আবার পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে থেকে। তাই বোমা-বিপ্লবীর আদান-প্রদান ও মত বিনিময়ের গুপ্ত ঠিকানা ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলার নির্জন স্থল। তারই পাশে আড়িয়াদহের বাচস্পতি পাড়ায় এক পুরোনো নির্জন বাড়িতে তৈরি হতো বোমাবারুদ; তা বিপ্লবীরা ছড়িয়ে দিতেন ভারতের নানাস্থানে। 'দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা' ছিল তারই অনুষঙ্গজাত এক গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ।

স্বাধীনতাকামী গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির মূল শক্তি ছিল বাঙ্গলার শক্তিভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে ব্যায়ামের আখড়ার আড়ালে বঙ্গদেশে স্থাপিত হয় সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'। এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং। শাক্তদর্শনে বিশ্বাসী ছিল এই সংগঠন। সিস্টার নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ, জাপানি কাকুজ ও কাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সংগঠনের। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি শিখতেন সদস্যরা। পাঠ নিতেন নৈতিকতার এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতার। স্বামীজীর দর্শন ও দেশপ্রেম তাদের নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। নিবেদিতার বাসাও ছিল গুপ্ত সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

আগামী দিনের জন্য সমস্ত দিক থেকে ভারতবর্ষ প্রস্তুত থাকুক— এটাই শ্রীঅরবিন্দের বাণী, এটাই স্বামীজীর কথা। স্বামীজী বলতেন, 'স্বাধীন হওয়ার পর আরও পঞ্চাশ বছর লাগবে উঠতে। আর তখন উন্নতির শ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করবে ভারত।' স্বাধীন হবার পঞ্চাশ পেরোবার পরই অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এসেছে ভারত, নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, তিনি তাঁরই পথ অনুসরণ করে চলেছেন। অখণ্ড ভারতবর্ষের মানচিত্রকে সামনে রেখে এ যেন শক্তিমন্ত্রের ধ্যান। এই ধ্যান-মন্ত্র তাঁরা কোথায় পেলেন?

বঙ্গসংস্কৃতির আঙিনা থেকেই একদিন বঙ্গীয় যুবকদের শক্তির উৎসকে খুঁজে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ। ব্রিটিশ ভারত তখন তোলপাড়। উপস্থাপিত হলো বাঙ্গলার শক্তি-সাধনার এক অনন্য ধারা। যে বাঙ্গলা তন্ত্রের পীঠস্থান, যেখানে আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, যেখানে ভগবান মাতৃরূপে সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত, তারই আদলে দেশমাতৃকাকে দেখার চৈতন্য উদিত হলো। যুবকেরা তাঁরই মধ্যে খুঁজে নিলেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির উপাদান। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'কোন অমানুষ/তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল!' শক্তি ও সুন্দরের যাবতীয় ভাণ্ডার যে মাতৃদেবীর মধ্যেই নিহিত, তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দুর্গাস্তোত্র'-এ। দুর্গাস্তোত্র ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে একটি অন্যতম সৃষ্টি, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামী যুবকবৃন্দের জপমন্ত্র। দেবী দুর্গা এখানে দেশজননীরূপে প্রতিভাত। সকল কাজেই দুর্গাপূজার প্রয়োজনীয়তা, তিমিরবিনাশী আভায় লড়াইয়ে পথ, 'বীরমার্গপ্রদর্শিনী, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব কার্য্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় শক্তিময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।' প্রেক্ষাপট বঙ্গদেশ হলেও, বাঙ্গলার তরুণদলের একাত্ম প্রার্থনা হলেও, তা আসলে ভারত-বাণী; তা আসলে বিশ্বজননীর বোধ। মা দুর্গা এখানে কখন যেন বঙ্গভূমি অতিক্রম করে ভারতমাতা হয়েছেন, হয়ে উঠেছেন জগদম্বে। আজও যখন বাঙ্গালি ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে জাতীয় বিকাশের ধারাপাতে, নানান চোরাস্রোতে তলিয়ে যাচ্ছে তার যাবতীয় ক্ষাত্রবল, ভীরু-পলায়নপর জাতি হিসাবে প্রতিভাত হচ্ছে অনুক্ষণ, তখন বাঙ্গালি যেন পুনর্পাঠ করে দুর্গাস্তোত্রের টেক্সট। আর নিমেষে শক্তিমান হয়ে অশুভশক্তির টুঁটি চেপে ধরতে পারে। দুর্গাস্তোত্রে পাচ্ছি, মাতঃ দুর্গে! কালীরূপিণী, নৃমুণ্ডমালিনী দিগম্বরী, কৃপাণপাণি দেবি অসুরবিনাশিনী! ক্রূর নিনাদে অন্তঃস্থ রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বিমল নির্মল যেন হই, এই প্রার্থনা, মাতঃ, প্রকাশ হও।। ▮

ভগিনী নিবেদিতার মননে কালী

স্বপ্না কুণ্ডু

কলকাতায় আসার কিছুদিন পর নিবেদিতা কালীঘাট মন্দির দর্শনে যান, সে সময় তাঁর পাশ্চাত্যমনে মূর্তিপূজা ও মন্দিরে পশুবলি যে জীবহিংসা এই ভাবটি পরিস্ফুট ছিল। দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজাতে অশিবনাশিনী কল্যাণময়ী শক্তির প্রকাশ কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কালী ও কালীপূজার মধ্যে তার বিপরীত ভাব তাঁকে বিচলিত করে। কিন্তু অল্পদিনেই নিবেদিতা স্বামীজী ও তাঁর গুরুভাইদের সাহায্যে বুঝেছিলেন বাঙ্গালির চেতনায় কালীপূজা ও মহাকালতত্ত্ব সৃষ্টির অন্তরালে দুর্জ্ঞেয় চিৎশক্তিরই প্রকাশ। ১৮৯৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কলেজ স্কোয়ারে অ্যালবার্ট হলে নিবেদিতার 'কালী ও কালীপূজা' শীর্ষক বক্তৃতা সাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সভাতে বহু সভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীমতী সরলা ঘোষাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ সরকার নিবেদিতার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। স্বামীজী নিবেদিতার বক্তৃতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ১৮৯৯-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি নিবেদিতা তাঁর প্রিয় বন্ধু মিস্ ম্যাকলয়েডকে লেখেন, 'Well—my lecture on Kali came off on Monday. The Albert Hall Crammed. 'Dear Old Dr. (Mohendra Lal) Sirkar spoke against Kali and me– with tears and was very touching when unfortunately an mad devotee of Sri R.K., got up and amdist tremendous excitement called him... an old devil.'

কালীতত্ত্বের ওপর নিবেদিতা তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দেন কালীঘাট মন্দিরের নাটমন্দিরে; কালীঘাট মন্দির কতৃপক্ষের আমন্ত্রণে ২৮ মে এদিন তিনি খালিপায়ে মন্দিরে যান এবং মহাপীঠের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্বক বক্তৃতা শুরু করেন। এই বক্তৃতায় নিবেদিতা কেবল তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই দেননি, হিন্দুজীবন ও তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ধর্ম তার সুনিপুণ ব্যাখ্যায় তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজকে মুগ্ধ করেন। বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'হিন্দুর পারিবারিক জীবনে মাতা ও পুত্রের সম্পর্ক সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও নিবিড়, জীবনের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত মায়ের সুগভীর ভালোবাসা ও স্নেহ। অনাদিকাল থেকে সৃষ্টির মূল কারণ সেই পরমেশ্বরকেই একান্ত আপন উপলব্ধি করে মাতৃ সম্বোধন করা হয়েছে। দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, কালী ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ। একই মহাশক্তিরই নানা প্রকাশ দশপ্রহরণধারিণী, অসুরবিনাশিনী বিশ্বজননী দুর্গা সেই মহাশক্তির অপূর্ব প্রতীক। চরাচর বিশ্বপ্রকৃতি ও তিনি জগদ্ধাত্রীরূপে সেই মহাশক্তিই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে আছেন। মহাকালী, যিনি ভয়ংকরা ও লোলরসনা, মৃত্যু ও ধ্বংস যাঁর চারিদিকে বেষ্টন করে আছে। সেই অগ্নিরূপা মহাকালীর কাছে সাধক ছোট্ট শিশুটি হয়ে যান, ইস্টদেবতাকে সর্বদা মাতৃরূপে দর্শন করেন। কাপুরুষ যে সেই মায়ের ভয়ংকর রূপে ভীত হয়।' নিবেদিতা বললেন, 'হিন্দুরা কোনও মূর্তিকে পূজা করে না কেবল প্রতীক অবলম্বনে মনকে তন্ময় ও একাগ্র করে আত্মবিস্মৃত হয়। প্রকৃত পূজা প্রতিমার সম্মুখে অবস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভের উপর অনুষ্ঠিত হয় এবং ওই পূর্ণ কুম্ভটিকে সেই অনন্তশক্তির প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। বলিদান প্রথার উল্লেখ করে নিবেদিতা বলেন, প্রকৃতপক্ষে কালীপূজায় অন্যকে উৎসর্গ করার পরিবর্তে আত্মোৎসর্গের বিধান আছে। এই আত্মোৎসর্গই পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। এরমধ্যেই সাধকের শক্তিলাভের সকল রহস্য নিহিত। শক্তির উদ্ভব ত্যাগে।

নিবেদিতা ভারতবাসীকে নিজেদের শিল্প ও পুরাণ সম্পর্কে পাশ্চাত্যভিমুখী দৃষ্টি ও তুলনামূলক মনোভাব পরিহার করতে বলেন। মাতৃভাবের চরম বিকাশের জন্য আরও উচ্চভাব ও শ্রদ্ধার আরোপ প্রয়োজন। তবেই ভারতবাসীর পক্ষে যথার্থ মহান ও জাতীয় এমন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।' ভারতের জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন ভগিনী নিবেদিতার কণ্ঠে এই বক্তৃতার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয়েছিল। ভারতীয় ভাব ও আদর্শের এই পরম সমন্বয় তাঁর জীবনে ঘটেছিল যা ছিল আধ্যাত্মিক জাগরণেরই নামান্তর। নিত্য ও লীলা, সৃষ্টি ও ধ্বংস, শবরূপী মহাকালের বক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়রূপিণী মহাকালীর আবির্ভাব এই উপলব্ধিতে তিনি সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর অনুভবে 'হয়তো অনন্তকাল ধরে পথ চলার শেষে যখন দ্বৈতবোধ চলে যাবে এবং ঈশ্বরও আর ঈশ্বর থাকবেন না তখন সেই অপার অনুভব আসবে।' এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আনন্দময়ী মা সবসময় তাঁর দিব্য নৃত্য নাচেন মৃত (ব্যক্তি) ঈশ্বরের বুকের ওপরে।'

নিবেদিতার প্রথম বই 'কালী দ্য মাদার'। আমেরিকার রিজালম্যাপরে বসে লেখেন এবং জুলাই ১৯০০ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়, বইটি তিনি উৎসর্গ করেন বীরেশ্বরকে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দকে। গুরুর আদর্শই ছিল তাঁর চলার পাথেয়। এই বই-এ লিখেছেন, 'নিজের জন্য কোনো করুণার প্রত্যাশা রেখো না, নিজের অন্ধকারকে তুমি সাহসের সঙ্গে বরণ করে নাও, তাহলে তোমার আলো সর্বজনের সুখের কারণ হয়ে উঠবে। তুচ্ছতম কাজটি সযত্নে সম্পন্ন কর, মুছে ফেলো উচ্চমঞ্চের বাসনা।' এই বইয়ে 'প্রতীক পূজা' অধ্যায়ে তিনি সাধককে বর্ণনা করেছেন ছোট্ট শিশুর সঙ্গে যে ইস্টদেবতাকে সর্বদা মাতৃরূপে দর্শন করে। মাতৃভাবনার এই সার্থক রূপের প্রকাশ ভারতবর্ষে এখানে কালী ঈশ্বরের প্রতীক ও নারীরূপে কল্পনা করে মা বলে সম্বোধন করাই স্বাভাবিক। ঈশ্বর প্রতিমার কল্পনা বিবসনা নারীরূপে তিনি আলুলায়িত কুন্তলা, ঘোর নীলগাত্রবর্ণ কৃষ্ণ কালো রূপে প্রতিভাত, চতুর্ভুজা; দুই হাতে বরাভয়, অপর দুই হাতে অসি ও রক্ত নিষ্ক্রান্ত নরমুণ্ড, কণ্ঠে নর করোটির মালা, লোলজিহ্বা। শ্বেত ভস্ম বিভূষিত অঙ্গ এক পুরুষের বক্ষে তিনি নৃত্যপরা। আমাদের একান্ত আপনজন এই কালীরূপ, জীবনটা তাঁর সঙ্গে লুকোচুরি খেলামাত্র, খেলতে খেলতে যদি তাঁর চরণদুটির ছোঁয়া যায় তবেই দিব্য জাগরণ, মা ডাকের মহা উল্লাস। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন।

'শিব-স্বরূপ' অধ্যায় নিবেদিতা শুরু করেছেন ওয়াল্ট হুইটম্যানের

কবিতা দিয়ে...

সতত সঞ্চারিছ তুমি নিঃশব্দ লঘু চরণে
আহ্বানের প্রগাঢ় মন্ত্র উচ্চারিছে কোথা সে কোনজনে,
হে মাতঃ রাত্রিরূপিণী? (মাতৃরূপা কালী)

পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব। ভারতে কালী সম্পর্কে বলা হয় তিনি শিবেরই এক শক্তি। হিন্দুদের কল্পনায় দেবতা হয়েছেন নিঃস্ব ভিখারি। অঙ্গে তাঁর তুষারশুভ্র যজ্ঞভস্ম, মস্তকে অযত্ন বর্ধিত পিঙ্গল জটাভার, নয়নদুটি অর্ধনিমীলিত; প্রতি শ্বাসে সৃষ্টি হচ্ছে জগৎ, প্রশ্বাসে ঘটছে বিলয়, তিনি নির্বিকার। ভ্রূমধ্যে উন্মীলিত তাঁর তৃতীয় নয়ন— অন্তঃশ্চক্ষু। জগৎকে রক্ষা করতে তিনি গরল পান করে হয়েছেন নীলকণ্ঠ। পুরুষ বা পরমাত্মারূপে তিনি মায়া, প্রকৃতি রূপ মহাকালী প্রলয় নৃত্যে উগ্ররূপা, মহেশ্বরের বুকে পতিত তাঁর একটি চরণ। সেই ভীষণা দেবীর অতলে নিমজ্জিত হয়ে শিবের দৃষ্টি স্থির, সেই দৃষ্টিতে কালীতত্ত্বের উপলব্ধিতে তাঁকে মা বলে সম্বোধন করেন। আত্মা ও ব্রহ্মের সেই তো পরম মিলন মুহূর্ত। শক্তি উপাসনার এই সুগভীর তত্ত্ব নিবেদিতার জীবনব্যাপী সাধনায় এই মহাকালী বা চিৎশক্তি অবিচ্ছেদ্য ছিল।

'Two Saints of Kali' অধ্যায়ে নিবেদিতা রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন চিত্রিত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে রামপ্রসাদ হয়েছেন, 'interpreter of Man's love of God', অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসার ব্যাখ্যাতা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, রামপ্রসাদ সম্পর্কে নিবেদিতার রচনা বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান। রামপ্রসাদের লেখনিতে 'মায়ের পদতলে' নিবেদিতার ইংরেজি তর্জমায় তা হয়েছে 'Mother's Lotus-feet', যে পাদপদ্মের ধারণায় মাতৃভাবকে আরও মহিমান্বিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে লেখা 'great incarnation of the spirit of the Mother towards Her children', 'সন্তানের প্রতি জগজ্জননীর যে ভাব তারই মূর্তিমান রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বব্যাপী ভালোবাসা জগতের প্রতিটি জীবের জন্য ব্যাকুল হতো, তাকেই একমাত্র মাতৃরূপিণী ঈশ্বর বলা যায়। সমগ্র মানবজাতির অনুভব ও ভাবরাশির সংমিশ্রণ এবং কালীগত প্রাণ এই রামকৃষ্ণ হলেন মানবতার মূর্ত বিগ্রহ। নিবেদিতার মহত্ত্ব এমনই তিনি কেবল স্বামীজীর বাণীর সর্বজনীন মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তা নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের দেবত্ব ও শ্রীমায়ের মাতৃত্ব উপলব্ধি করে রামকৃষ্ণ-সারদাময় হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা'।

'ভয়েস্ অব দ্য মাদার', 'মাতৃ আহ্বান' অধ্যায়ে নিবেদিতা লিখেছেন, 'উত্তিষ্ঠত। বৎস মানুষ হও! অদৃষ্ট স্বরূপ বর্ষিত তোমার প্রাপ্য, দৃপ্ত পৌরুষে বহন কর, যে কর্তব্যভার অর্পিত হয়েছে নির্ভয়ে সকল শক্তি দিয়ে তা পালন কর। ভুলো না, আমিই পুরুষকে দিয়েছি পৌরুষ, নারীকে নারীত্ব, আমিই বিজয়দাত্রী, আমি তোমার জননী। আমার হৃদয় অন্তঃস্থলে মহাকালীর উদ্যত খড়্গ ঝলসাচ্ছে, খড়্গারূপিণী মায়ের অবতরণকালে তাদের আবির্ভাব, জন্মলগ্ন হতেই তারা মাতৃ উপাসক। তারা জীবন প্রেমিক নয়, মরণপ্রেমিক। ধর্ম যে নামেই তাকে আখ্যায়িত করা হোক না কেন চিরকাল তার অর্থ হলো মৃত্যুকে ভালোবাসা। অন্তরঙ্গজনেরা উদ্বুদ্ধ হবে আত্মত্যাগের ব্রতে। আমি ও স্বয়ং কালী, মানব জননী।' বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও বাঙ্গলার বিপ্লবীরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন 'মাতৃআহ্বান' পড়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই বইটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'মহারাজ আপনার কাছে কি সেই ছবিটি আছে যাতে মা কালীর পায়ের কাছে বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।'

'দি স্টোরি অব দি কালী' নিবেদিতা ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বরে মিসেস লেগেটের শিশু কন্যাকে উদ্দেশ করে মা কালী সম্বন্ধে এই গল্পটি রচনা করেন। এখানে মা কালীকে স্নেহময়ী জগজ্জননী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মার সঙ্গে খুকুর লুকোচুরি খেলা, জগন্মাতা চোখ বন্ধ করে তার সন্তানের সঙ্গে খেলা করেন। যদি কেউ তাঁর চোখ খুলে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মেলাতে পারে, তবে সেই মুহূর্তে সে সকল রহস্য অবগত হয়, শক্তি জ্ঞান ও প্রেমে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিই মায়ের চোখ বন্ধ থাকে না। আমাদের চারিদিকে অন্ধকার তাই মনে হয় তিনি চোখ ঢেকে আছেন। যে মুহূর্তে তুমি কেঁদে উঠবে, মা এখনই তাঁর সুন্দর করুণাভরা দৃষ্টি তোমার দিকে মেলে ধরবেন। নিবেদিতার কালী সাধনায় স্বামীজীর 'Kali the Mother, (কবি সতেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত বাংলা অনুবাদ 'মৃত্যু রূপা মাতা')-এর প্রভাবে মৃত্যু দর্শনের ভূমিকাই মুখ্য।

'কালী তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মা গো আয় মোর পাশে
সাহসে যে দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'
(স্বামী বিবেকানন্দ)

পরবর্তীতে নিবেদিতার কলকাতায় প্লেগের সময়ে সেবা ও দেশে জাতীয়তার উদ্বোধনে নিজেকে আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা ছিল স্বামীজীর 'Kali the Mother' কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের আদর্শ প্রতিকৃতি। ২০.১১.৯৯ তারিখে ম্যাকলাউডকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন, 'যদি আমি কালী, শিব, গুরুভক্তি এবং বাকি সকল বিষয়ে তাঁর (স্বামীজীর) মনের অভ্যন্তরের কথা জানতে না পারতাম, তাহলে আমার মধ্যে এমন শক্তি আসতো না।' 'Yes I didn't know his (Swami Vevekananda) innermind about Kali and Siva and Guru- bhakti and all the rest I could not have this strength.' নিবেদিতার চিন্তনে তাই 'শিব' ছিলেন উপলব্ধির স্তরে আর 'শক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল তার কর্মপ্রেরণার শক্তিস্বরূপ। অবলা বসুর স্মৃতিচারণায়, দার্জিলিঙে অন্তিম মুহূর্তে নিবেদিতার কণ্ঠ থেকে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত সেই অমোঘবাণী-- অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়, আবীরাবীর্ম এধি। (হে স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম আমার নিকট জ্যোতির্ময় রূপে আবির্ভূত ২৬)। The boat is suiking, still I shall see the Sunrise। তাঁর মুখমণ্ডল আধ্যাত্মিক বিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মুক্তিপ্রাণা মাতাজী লিখেছেন, 'হিমালয়ের তুষার শিখরে তখন সবে সূর্যোদয়, নবারুণ রশ্মির এক ঝলক এসে পড়ল কক্ষের মধ্যে আর নিবেদিতার আত্মা বিলীন হয়ে গেল অসীম অনন্ত সত্তায়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শতপ্রাণা সাধিকার ব্রত সংসিদ্ধ হলো।' হে মহাপ্রাণ তোমায় শতকোটি প্রণাম। নিবেদিতা ছিলেন নারী দধীচি, তিনি জীবনকে ভারতের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত করে স্বয়ং আমাদের কাছে আলোকদূতী রূপে প্রকাশমান। ■

মেয়ের নাম করুণা মায়ের নাম করুণাময়ী

অনামিকা দে

করুণাময়ী কালীবাড়ি পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতার বুকে অবস্থিত। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায় আদিগঙ্গার তীরে অবস্থিত অতি পুরনো মন্দির 'করুণাময়ী মন্দির'। মূল কালীমন্দিরের সঙ্গে বারোটি শিবমন্দির, একটি গণেশ মন্দির ও একটি রামকৃষ্ণ মন্দির রয়েছে।

সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবারের জমিদার তথা কালীসাধক নন্দদুলাল রায়চৌধুরী তাঁর সাত বছর বয়সি মেয়ে 'করুণা'র নামে এই কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায় পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর মা কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। জনশ্রুতি অনুসারে কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে নন্দলদুলাল আদিগঙ্গার তীরে সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের ঘাটে গিয়ে একটি পাথর পেয়েছিলেন। সেই পাথরেই মূর্তিটি তৈরি হয়। এই মূর্তির বৈশিষ্ট্য হলো, কালী ও শিব একই পাথরে নির্মিত। নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর তিন পুত্র সন্তান— রাঘবেন্দ্র, রামচরণ ও জগন্নাথ। কিন্তু তিন পুত্রের পিতা হলেও নন্দদুলালের খুব সাধ হয় একটি কন্যাসন্তানের। প্রার্থনা করেন তার আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে এবং অবশেষে ঈশ্বর তাকে এক ফুটফুটে কন্যাসন্তান উপহার দেন। নন্দদুলাল তার নাম রাখে করুণা। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সাত বছর বয়সেই তার মৃত্যু ঘটে। করুণার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পিতা বাকরুদ্ধ হয়ে যান। নন্দদুলাল স্থির করেন সবকিছু ছেড়ে কন্যার স্মৃতি বুকে নিয়ে তীর্থক্ষেত্রে বেরিয়ে যাবেন। এমতাবস্থায় আরাধ্যা দেবীর উপাসনায় বসে নন্দদুলাল স্বপ্নাদেশ পায়, স্বপ্নে মেয়ে করুণা আরও বলে, 'বাবা তুমি কেঁদো না। আমি কখনো তোমায় ছেড়ে যাব না। আদিগঙ্গার তীরে যাও পুরনো বটগাছের নীচে কালো পাথর পাবে, সেই পাথরের মূর্তি তৈরি করো, তাতেই আমি থাকবো চিরকাল।' এই স্বপ্নাদেশ পেয়েই নন্দদুলাল আদিগঙ্গার তীরে গিয়ে সেই পাথর পান এবং শিব-কালী মূর্তি তৈরি হয়। অবশেষে ১৭৬০ সালে করুণাময়ী মন্দির প্রতিষ্ঠা পেল আদিগঙ্গার সাবর্ণ রায়চৌধুরীর ঘাটে।

বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার 'মহানায়ক উত্তম কুমার' মেট্রো স্টেশনের সামনে, টালিগঞ্জ এলাকায় অবস্থিত এই 'করুণাময়ী মন্দির পশ্চিমবঙ্গের বুকে একটি তীর্থস্থান বলা যায়। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা মায়ের দর্শনে আসেন। মন্দিরকে ঘিরে কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসাও স্থান পেয়েছে এই অঞ্চলে। তবে এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে দক্ষিণা দেওয়ার কোনওরকম বাধ্যবাধকতা নেই। দর্শনার্থীরা সামর্থ্য অনুযায়ী মন্দিরের প্রণামী বাক্সে দান করতে পারেন। মন্দির প্রাঙ্গণে ১২টি শিব মন্দির অবশ্যই আলাদা মাত্রা জুগিয়েছে। এছাড়াও রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। সুসজ্জিত ফুলের বাগান, দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বইয়ের একটি স্টল, যেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, সারদামায়ের বাণীর বই এবং অধ্যাত্ম চেতনার বইও পাওয়া যায়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ছোটো অনাথ আশ্রমও আছে। মন্দির কর্তৃপক্ষই এদের সম্পূর্ণ দেখাশোনা করে। প্রায় ২৫টি শিশু বিভিন্ন বয়সি, তারা একসঙ্গে মন্দিরের সুষ্ঠ নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে মায়ের আশিস নিয়ে বড়ো হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে করুণাময়ী মন্দির প্রাঙ্গণের আরও একটি আকর্ষণ হলো এখানে বর্তমানে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এবং ধারাবাহিক অনুষ্ঠানের অনেক শ্যুটিং হয়। প্রায় সেই করণে ভিড় লেগেই থাকে। সব মিলিয়ে করুণাময়ী কালীমন্দির এখন কলকাতার বুকে খুবই জাগ্রত একটি তীর্থস্থান। প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের প্রথম তারিখে এখানে কল্পতরু উৎসব পালিত হয়। মায়ের কৃপায় সকল দর্শনার্থীকেই সেদিন মায়ের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। □

দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

SUNITA JHAWAR

কাউন্সিলার ও বিজেপি নেত্রী

৪২ নং ওয়ার্ড, কোলকাতা পুরসভা

KISHAN JHAWAR

উত্তর-পশ্চিম কোলকাতা জেলা সভাপতি

বিজেপি

Mobile : 9830050425

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

32, Ezra Street, Room No. 854,
Kolkata - 700 001
Phone (O) 2235-0277, 9934

With Best Compliments from :

Singhania & Co.

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1

শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা সহ—

উমেশ গোয়েঙ্কা

নিয়ামতপুর, পো ঃ সীতারামপুর, জেলা - বর্ধমান

পূজা ও দীপাবলীর অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

Shree Nursing Electric Stores

ভাই-বোনের পবিত্র স্নেহের পরশ— ভাইফোঁটা

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

কোনো এক অখ্যাত অজপাড়াগাঁয়ে পূর্ণিমার সন্ধ্যায় এক মা তার দুধের শিশুটির কান্না ভোলাবার অছিলায় বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডান হাতের মধ্যমাটি যখন তার আদরের দুলালের কপালে ছুঁয়ে বলে ওঠেন, 'আয় আয় চাঁদমামা 'টিপ' দিয়ে যা, আমার চাঁদের কপালে চাঁদ 'টিপ' দিয়ে যা'— তখন শিশুটিও অবাক বিস্ময়ে তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ দুটি দিয়ে তাকিয়ে থাকে সুদূর আকাশে ভেসে থাকা সেই রূপালি থালাটির দিকে। ছোট্ট সোনামণির কপালে লাগানো কালো কাজলের ফোঁটাটি তখন যেন কালো নয় রূপালি চাঁদের আভায় রৌপ্যবর্ণ ধারণ করেছে। মা তার সব আদর উজাড় করে চুমু খায় সে কপালে। কপালে লাগানো মায়ের ফোঁটা আর চাঁদের দীপ্তি তখন যেন মিলে মিশে একাকার।

কপালে ফোঁটা দেওয়া হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন রীতি। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রেম, ভক্তি, পরমেশ্বরের কাছে প্রিয়জনকে রক্ষা করার আকুতি। শিশুর জন্মের পর তার ওপর যাতে কোনো কুনজর না লাগে তাই মা-ঠাকুমা-জেঠিমারা শিশুর কপালে এঁকে দেন কাজলের ফোঁটা— এই পরম্পরা যে কত প্রাচীন তা আজ গণনা করা কঠিন।

যে কোনো যাগ-যজ্ঞ-পূজায় দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত চন্দন বা সিঁদুরের ফোঁটা কপালে লাগানোর রীতি আজও সারা দেশে প্রবহমান। পূজার শেষে পুরোহিতমশাই যজমানের কপালে এঁকে দেন এই ফোঁটা— কামনা যে, ঈশ্বর যেন তাঁকে, তার পরিবারকে ধন-যশ-মান-সুখ-সমৃদ্ধি-সুস্বাস্থ্য প্রদান করেন। আর নারীরা তো বিবাহের পুণ্য আসরেই কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর লাগানোর যে অধিকার পায়— তা সে স্বামীর জীবনের শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। ঈশ্বরের কাছে তার একটাই কামনা আমার স্বামী, আমার পরিবারের তুমি মঙ্গল করো প্রভু, আমার সিঁথির সিঁদুর তুমি অক্ষয় রেখো।'

ভাইফোঁটা ভারতের এক প্রাচীন লোকাচার। হিন্দুধর্মে ভাই-বোনের সম্পর্ক এক পবিত্র স্নেহের বন্ধন। এই স্বর্গীয় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ হলো ভাইফোঁটা। বঙ্গপ্রদেশে যাকে আমরা ভাইফোঁটা বলি মধ্য ও উত্তর ভারতে তা হলো ভাইদুজ, আর অবশিষ্ট ভারতে তাই যম দ্বিতীয়া নামে খ্যাত।

জন্ম থেকে বিবাহ পর্যন্ত ভাই-বোনের বাল্য-কৈশোর-শৈশব কাটে স্নেহ-প্রীতি-মমতা-ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিবাহের পর ছেদ পড়ে সেই একাত্ম আনন্দের। বিবাহিত বোন চলে যায় শ্বশুরাড়িতে, ভাইও ব্যস্ত হয়ে পড়ে নিজের সংসার জীবনে। ভাই-বোনের বাল্যজীবনের আনন্দে বেড়ে ওঠার সেই স্মৃতি থেকে যায় সারাজীবন, ভাইফোঁটা হলো সেই স্মৃতিরোমন্থনের বার্ষিক মিলন। এ যেন ভারতের ভগিনী দিবস— সিস্টার ডে অব

ইন্ডিয়া।

এরও ইতিহাস বহু প্রাচীন। পৌরাণিক মতে যমলোকের রাজা যমরাজ হলেন মৃত্যু ও কাল-এর দেবতা। মানুষের মৃত্যুকালে তিনি বাহন মোষের পিঠে চড়ে এসে মানুষের আত্মা নিয়ে যান যমপুরীতে। যেখানে কর্ম অনুসারে তাকে স্বর্গ-সুখ বা নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এই যমরাজের পিতা হলেন সূর্যদেব ও মাতা ছায়া বা সংজ্ঞা। তাঁদের যমজ সন্তান— একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র হলেন যম আর কন্যা হলেন যমুনা বা যমী। বাল্যকাল থেকেই ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক। বড়ো হয়ে যম হলেন যমলোক বা মৃত্যুলোকের রাজা। আর যমনুনার সঙ্গে বিবাহ হলো চিত্রগুপ্তের। যমরাজ ভগিনী যমুনাকে খুবই স্নেহ করতেন কিন্তু কর্মব্যস্ততায় যমুনার শ্বশুরালয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার সময় পেতেন না। একদিন হঠাৎ যমরাজ স্বয়ংই যমুনার বাড়িতে উপস্থিত। দাদাকে দেখে বোনের আনন্দের শেষ নেই। যমুনা দাদাকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, দীপ-ধুপ জ্বালিয়ে স্বাগত জানালেন, ভালো-মন্দ খাবার তৈরি করে পেট ভরে খাওয়ালেন। যম বোনের আতিথ্যে ও ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে বর দিতে চাইলেন। যমুনা বললেন, 'আমার জন্য কোনো বর চাই না, কিন্তু কথা দাও প্রতিবছর এই দিনে তুমি আমার বাড়িতে একবার অন্তত দেখা করতে আসবে। আর আজ থেকে যে বোনেরা এই পবিত্র দিনে ভাইকে স্নেহের ফোঁটা দিয়ে ভালোবাসা জানাবে সেই ভাই-বোন যেন তোমার যমলোকের ওই নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়।' যমরাজ খুশি হয়ে বললেন, 'তথাস্তু। আর শুধু তাই নয়, প্রতিবছর কার্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া তিথিতে যে ভাই তার বোনের হাতের ফোঁটা লাগিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করবে— তার মৃত্যুভয় থাকবে না।'

সেদিন থেকে এই পুণ্যতিথিকে যম দ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা বলে পালন হয়ে আসছে। এই দিনে বোনেরা ভায়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে একটি শ্লোক উচ্চারণ করে; 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/ যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা/ আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা/ যম যেমনি অমর/ আমার ভাই হোক তেমনি অমর।' যেমন করে যমুনা যমকে ফোঁটা দিয়ে ঈশ্বরের কাছে ভাইয়ের অক্ষয় জীবন কামনা করেছিলেন তেমনই আজও এদেশের ঘরে ঘরে বোনেরা ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে তার ভায়েদের অক্ষয় জীবন কামনা করে। শুধু তাই নয়। দ্বাপর যুগেও ভাইফোঁটার কাহিনি উল্লেখিত আছে মহাভারতে। অত্যাচারী রাক্ষস নরকাসুরকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ভগিনী সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করতে যান। যুদ্ধজয়ী দাদাকে দেখে সুভদ্রার আনন্দের শেষ ছিল না। তিনি দাদার কপালে তিলক লাগিয়ে বিনম্র প্রণাম জানালেন তাঁর পায়ে। অভ্যর্থনা করলেন ফুল, মালা, দীপ ও মিষ্টি দিয়ে। দাদার পদধূলিতে সুভদ্রার ঘরে সেদিন খুশির বন্যা। কাকতালীয়ভাবে সেই দিনটিও ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া তিথি।

সেই পৌরাণিক যুগ থেকে প্রাচীন যুগ। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক সমাজ— বদলে গেছে অনেক কিছুই, কিন্তু বদলায়নি ভারতের শাশ্বত পরম্পরা, সাংস্কৃতিক প্রবাহ। যমুনার যমকে দেওয়া ফোঁটা হতে যে পরম্পরার সূচনা হয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণকে সুভদ্রার দেওয়া সপ্রেম তিলকদানে তা শেষ হয়ে যায়নি। আজও বাঙ্গলার কোনো এক প্রত্যন্ত গাঁয়ে কার্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্যতিথিতে দূর থেকে ভেসে আসে শাঁখের শব্দ— যেখানে কোনো এক ছোট্ট বোন তার দাদার কপালে চন্দনের ফোঁটা ঠেকিয়ে উচ্চারণ করে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা সেই প্রাচীন শ্লোক— 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা...। তারপর দাদা তার ছোট্ট বোনের মাথায় ধান, দূর্বা দিয়ে ঝরিয়ে দেয় আশীর্বাদের বন্যা— এ হলো এদেশের জীবন দর্শন।

কবি বলেছেন— 'ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'— প্রকৃতপক্ষে এই পবিত্র স্নেহের সম্পর্ক শুধু আমাদের সংস্কৃতি, আমার জন্মভূমিতেই মেলে। পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি তার সৃষ্টি হয়নি। যদিও-বা সৃষ্টি হয়— যুগ যুগ ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কেউ সযত্নে লালিতপালিতও করেনি।

প্রবুদ্ধ ঔপন্যাসিক এস ওয়াজেদ আলি এদেশের প্রাচীন সনাতন সমাজের প্রবহমান ধারা দেখেই লিখেছিলেন তাঁর কালজয়ী প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ'— যেখানে ছিল তার বিখ্যাত উক্তি— 'সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে।' ভাইফোঁটা বুঝি তার সার্থক উদাহরণ। □

বিভিন্ন রাজ্যে ভাইফোঁটা

- পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা—ভাইফোঁটা।
- বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পঞ্জাব ইত্যাদি হিন্দিভাষী রাজ্য—ভাইদুজ।
- ওড়িশা—ভাইজিউন্তিয়া।
- মহারাষ্ট্র, গুজরাট, গোয়া, কর্ণাটক—ভাউবীজ।
- অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা—ভাত্রুদ্বিতীয়া, ভগিনী হস্ত ভোজনামু।
- সিকিম, নেপাল—ভাইটিকা।

সংকট নিরসনে সমগ্র বিশ্বের প্রত্যাশা ভারতই পূরণ করতে পারে : মোহনরাও ভাগবত

এই বছর বিদেশি শাসন থেকে আমাদের মুক্তির ৭৫তম বছর। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। এই দেশকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা আমাদের রাষ্ট্র-রথের রাশ ওইদিন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম তার লক্ষ্য ছিল প্রকৃত 'স্ব-তন্ত্র' অর্থাৎ রাষ্ট্রপরিচালনার একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আমরা সবাই জানি যে আমরা এই স্বাধীনতা রাতারাতি অর্জন করিনি। ভারত-আত্মার ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, আদর্শ রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের জন্যে জাতি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই ভূখণ্ডের প্রায় সমস্ত অঞ্চলের বীর স্বাধীনতা-সেনানীরা আত্মত্যাগ ও তপস্যা করেছিলেন। সমগ্র সমাজ এই স্বাধীনতা-সেনানীদের মতোই দাসত্বের দংশন সমান অনুভব করে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই অবস্থাতেই অহিংস আন্দোলন থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত সমস্ত পথ স্বাধীনতার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তবুও আমাদের মধ্যে কৃত্রিম বিভাজন, আমাদের স্বধর্ম, স্বরাষ্ট্র ও স্বতন্ত্রের সঠিক ধারণা সম্পর্কে স্বচ্ছতার অভাব, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচারিতা, সর্বোপরি চতুর ইংরেজের কূটনীতির কারণে দেশভাগের যন্ত্রণা প্রতিটি ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে আছে। আমাদের সম্পূর্ণ সমাজ বিশেষ করে নবীন প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস জানতে, বুঝতে ও স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের মনে যেন কারোর প্রতি কোনও শত্রুতার ভাব না থাকে। নিজেদের মধ্যে থাকা সবরকম বিদ্বেষভাবকে সরিয়ে রেখে আমরা এমনভাবে এগিয়ে যাব এবং নিজেদের ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করবো যাতে অতীতের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আবার হতে না হয়। যারা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চায় তাদের চক্রান্ত এভাবেই আমরা ব্যর্থ করে দেব।

সামাজিক সদ্ভাব :

একটি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত রাষ্ট্র নির্মাণের পূর্বশর্ত একটি সদ্ভাব সম্পন্ন এবং বৈষম্যহীন সমাজের অস্তিত্ব থাকা। বহু প্রাচীন সময় থেকে আসা জাতপাতভিত্তিক বিভাজনের সমস্যা এই লক্ষ্য অর্জনের পথে বড়ো অন্তরায়। এই সামাজিক অভিশাপকে সমূলে উৎখাত করার জন্য বিভিন্ন উপায় এবং বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কারমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তবুও এখনো এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা সম্ভব হয়নি। জাতপাতভিত্তিক বিষময় দৃষ্টিভঙ্গি এখনো আমাদের সামাজিক চেতনাকে তাড়িত করে। বৌদ্ধিক আলাপ-আলোচনা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সদ্ভাব নির্মাণের পক্ষে যারা কাজ করছেন তাদের প্রচেষ্টা ও কণ্ঠস্বরকে অনেক সময় ছাপিয়ে যাচ্ছে— এটা দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে সদ্ভাব নির্মাণের উদ্দেশ্যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা যেন ইতিবাচক হয়। যারা সদ্ভাব সম্পন্ন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিমণ্ডলের স্বপ্ন দেখেন তাদের

ফঃ ৫

সকলকে এই লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টা করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ভাববিনিময় সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করতে পারে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সামাজিকভাবে সম্প্রীতিপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে সমাজে সদ্ভাবের পরিবেশ তৈরির কাজ করছেন।

স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় একাত্মতা :

স্মরণাতীতকাল থেকেই আমাদের রাষ্ট্রভাবনার মূল সুরটি ছিল সমগ্র ভারতবর্ষের অখণ্ডতা ও সংহতি বজায় রাখা এবং দেশের সকল মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা। এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণের জন্য যুগে যুগে মানুষ আক্ষরিক অর্থে তাদের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়েছে। এবছর গুরু তেগবাহাদুরজী মহারাজের ৪০০তম প্রকাশপর্ব (জন্মবার্ষিকী)। তৎকালীন ভারতবর্ষে নেমে আসা ধর্মীয় গোঁড়ামির ও কট্টরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তিনি বলি প্রদত্ত হন। ধর্মের স্বাধীনতা এবং নির্ভয়ে নিজের ধর্মবিশ্বাসের অনুশীলনের যে সংস্কৃতি এদেশে ছিল তা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টার জন্যই তিনি বিদেশি কট্টরবাদীদের বিষ নজরে পড়েন এবং আত্মবলিদান করেন। ধর্ম রক্ষায় তাঁর বীরোচিত ভূমিকার জন্য তিনি 'হিন্দ কি চাদর' বা 'ভারত রক্ষক' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ছিলেন সেই বীর যোদ্ধা— জ্যোতিপুঞ্জে সূর্যসম, যাঁরা যুগে যুগে দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারতবর্ষের মহান ঐতিহ্যকে অটুট রাখা এবং সর্বজনীন ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য প্রাণপাত করেছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি হলো মহান পূর্বপুরুষদের মনের রাষ্ট্রীয় গৌরব এবং ভারতমাতার জন্য উৎসর্গিত জীবনে মাতৃভূমির প্রতি ভক্তি এবং তাঁদের দ্বারা সংরক্ষিত ও পরিবর্ধিত আমাদের সর্বসমাবেশক সংস্কৃতি। ভারতীয় ভাবনায় 'মুক্ত জীবন'— এই শব্দবন্ধটি একটি নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে। মহারাষ্ট্রের সাধু জ্ঞানেশ্বর মহারাজ একটি প্রার্থনায় লিখেছেন— 'দুষ্টদের দুষ্টতার অবসান হোক এবং তাদের কর্ম সৎ হয়ে উঠুক। হতাশার কালো মেঘ সরে যাক, সকলের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত হোক এবং সেই আলোকেই সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক।' প্রায় একই অনুভবের প্রকাশ দেখি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' কবিতায়।

একটি আদর্শ স্বাধীন ভারত এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যখনই আমরা তুলনা করতে যাই তখনই এক ধরনের বৈপরীত্য লক্ষ্য করি এবং উপলব্ধি করি যে স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের লক্ষ্যে যে যাত্রা আমরা শুরু করেছিলাম তা এখনও অসম্পূর্ণ। পৃথিবীতে এমন কিছু শক্তি আছে যারা মনে করে যে ভারতবর্ষের অগ্রগতি এবং বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠালাভ তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ধরনের অপশক্তি কোনো-কোনো দেশে শাসন ক্ষমতায় বসে আছে। যদি ভারতে এমন ধর্ম বিরাজ করে যা সনাতন মূল্যবোধ-ভিত্তিক একটি বিশ্বের কথা বলে তাহলে সেইসব স্বার্থপর শক্তির অশুভ খেলা এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে। ভারত ধর্মীয় বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার প্রভাব অর্জন করে যা বিশ্বে হারানো ভারসাম্য পুনরুদ্ধার এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে। ভারত সেই ধর্মীয় বিশ্ব-দর্শন দ্বারা জারিত যা সারা বিশ্বকে হারিয়ে যাওয়া পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি ও মানবিক ভারসাম্য রক্ষায় দিশা দেখাতে পারে। ভারতবর্ষের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার জন্য সুসংগঠিত চক্রান্ত চলছে। ভারতের জনগণ, বর্তমান সময়, ভারতের ইতিহাস, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন কাজ করছে— তাদের সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন, ভুল ব্যাখ্যা ও প্রচারের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে এই অপশক্তিগুলি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কাজ করছে এবং আরও আক্রমণাত্মক হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের নিজেদের অবশ্যই সেই সমস্ত গোষ্ঠীর সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, সাবধানতার সঙ্গে নিজেকে এবং আমাদের সমাজকে এই ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে হবে। এককথায় সেই কুচক্রীরা তাদের পুরানো কৌশল বজায় রেখে এবং তাদের অপকর্মকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন উপায় অনুসন্ধান করছে। তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আগ্রাসী ধর্মান্ধ শক্তি নিজেদের পক্ষে সমর্থন জোটাতে ভুল তথ্য দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা, জনগণের ভ্রান্তির অপব্যবহার করা, তাদের বর্তমান এবং কল্পনাপ্রসূত সমস্যাগুলিকে অতিরঞ্জিত করে মানুষকে উস্কানি দেওয়া এবং যে কোনো ইস্যুতে একটি বিকৃত ব্যাখ্যা তৈরি করে লোক ক্ষেপিয়ে সমাজের অবমাননা করা--- এই সব ধ্বংসাত্মক অপকৌশল সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে।

আমাদের সমাজের প্রচলিত 'স্ব'-এর প্রকৃত অনুভব সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং সংশয়ের পাশাপাশি, কিছু নতুন বৈশ্বিক অবস্থান গতি লাভ করছে যা এইসব স্বার্থপর শক্তির অপকর্মগুলোকে বল জোগাচ্ছে। 'বিটকয়েনের' মতো অস্বচ্ছ, অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা যে কোনো দেশের আর্থিক স্থিতাবস্থা নষ্ট করার এবং তাকে মারাত্মক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ফেলার আশঙ্কা রাখে। বর্তমানে 'ওটিটি' প্ল্যাটফর্মে নির্বিচারে নানাবিধ বিষয়বস্তুর অনিয়ন্ত্রিত প্রচার চলছে আর এগুলো সকলের জন্য বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। বর্তমান অতিমারি পরিস্থিতিতে 'অনলাইন' শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়েছে। স্কুলের বাচ্চাদেরও এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। সচেতনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে এই সমস্ত নতুন প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি বা ব্যবস্থা আমাদের সমাজকে ভালো বা মন্দ কোন দিশায় নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে এখনই কোনো পূর্বানুমান করা সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তিগুলো কীভাবে এইসব নতুন উপায়গুলি অপব্যবহার করছে তা খুবই স্পষ্ট। সেজন্য সরকারের উচিত কালবিলম্ব না করে এসব পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া।

আত্মীয়তার বন্ধন :

তবে এইসব পদ্ধতির ক্ষতিকারক পরিণতি থেকে রক্ষা পেতে হলে নিজেদের পরিবারে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে পরিবারের সদস্যরা কী করা উচিত, কী অনুচিত; কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক— তার বিচারের সংস্কার পেতে পারে। অসংখ্য সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থা, বহু সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক— এই কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন। আমরাও আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এই ধরনের আচারণগত বিষয়গুলো সম্পর্কে চর্চা করতে পারি। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও 'আত্মীয়তার বন্ধন'— এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এই কাজ করে চলেছেন। আপনারা নিশ্চয় এই কথাটি শুনেছেন— 'মনকে নিয়ন্ত্রণ করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ন্ত্রণ'। এই বোধই ভারতীয় মূল্যবোধের ওপর যে বহুমুখী আক্রমণ তা প্রতিহত করে আমাদের

আস্থাকে অটুট রাখতে পারে।

করোনা অতিমারির মোকাবিলা :

করোনা অতিমারির তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছি। এই অতিমারির দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করে আমাদের সমাজ তার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। দ্বিতীয় ঢেউ অনেক বেশি মারাত্মক ছিল এবং বহু তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে গেছে। তবুও অতিমারির ভয় উপেক্ষা করে যারা মানুষের সেবায় প্রাণপাত করে কাজ করেছেন তাদের ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে। অতিমারিরূপ এই সংকটের মেঘ এখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। করোনার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই এখনো চলছে যদিও তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলার জন্য আমরা কম-বেশি প্রস্তুত। একসঙ্গে আরও বেশি সংখ্যার মানুষকে টিকা দিতে হবে এবং এই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সমগ্র সমাজ সজাগ আছে এবং স্বয়ংসেবকরা অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গ্রাম স্তর অবধি মনুষকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে যাতে তারাও সজাগ থাকেন এবং জরুরি পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন। একদিকে যখন আসন্ন তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলায় আমাদের সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন, অন্যদিকে আশা করা হচ্ছে যে চূড়ান্ত পর্যায়ের অতিমারি আক্রমণটি তুলনামূলকভাবে হালকা হতে পারে। তবে আমরা কোনো অনুমানের ওপর ভরসা না করে অবশ্যই সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার চেষ্টা করব এবং আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আসলে কোভিডের দুটি ঢেউয়ের মোকাবিলায় গৃহীত ‘লকডাউন’গুলো অর্থনীতিকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমাদের সামনে আগের ক্ষতিগুলো পূরণ করে আরও দ্রুত আর্থিক বিকাশ অর্জন করার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই লক্ষ্য অর্জনের উপায় খুঁজে বার করা এবং সেগুলো প্রয়োগের চেষ্টাও করা হচ্ছে। এই ধরনের প্রচেষ্টা অবিরাম হওয়া উচিত। কোভিড মহামারী দ্বারা উদ্ভূত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও আমাদের ভারতীয় অর্থনীতি নতুন গতিতে ফিরে আসার সম্ভাবনা ও আত্মবিশ্বাস দেখাচ্ছে।

কিছু সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে ব্যবসা-বাণিজ্য ইতিমধ্যেই পূর্বের অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে। এই আত্মবিশ্বাস ক্রমবর্ধমান যে, যদি সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের সকল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সফল হয়, তাহলে দেশটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতি অতিক্রম করে সহজেই এগিয়ে যাবে। একই সঙ্গে, এই পরিস্থিতি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করার এবং একটি দৃষ্টান্তমূলক ‘মডেল’ নির্মাণের সুযোগ প্রদান করতে পারে যা ‘স্ব’ অর্থাৎ স্বনির্ভরতার নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে।

আমাদের সমাজেও নতুন করে আত্মবিশ্বাস ও ‘স্ব’-এর বোধ জাগ্রত হচ্ছে। শ্রীরাম জন্মভূমি মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযানের সময় যে উচ্ছ্বসিত এবং আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে সেটাও এই জাগরণের একটি লক্ষণ। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসেবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে বিজয়ের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটছে। টোকিয়ো অলিম্পিকে ১টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক এবং প্যারালিম্পিকে দেশের জন্য ৫টি স্বর্ণ, ৮টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে আমাদের খেলোয়াড়রা অসাধারণ শৌর্য প্রদর্শন করেছেন, যা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। আমরা সবাই তাদের দেওয়া দেশব্যাপী সংবর্ধনার অংশীদার।

কোভিড মহামারী আমাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও ব্যবস্থার উপযোগিতা এবং স্বনির্ভরতা থেকে উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করেছে। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মোকাবিলায় আমরা আমাদের ঐতিহ্যবাহী জীবনধারা অনুশীলন এবং আয়ুর্বেদিক ঔষধি তথা চিকিৎসা পদ্ধতির কার্যকারিতা অনুভব করেছি। আমরা একটি সাশ্রয়ী অথচ কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারি না যা আমাদের বিশাল দেশের মধ্যে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তির নাগালের মধ্যে হতে পারে। আমাদের ভৌগোলিকভাবে বিস্তৃত এবং ঘনবসতিপূর্ণ দেশে, আমাদের স্বাস্থ্যসেবার পুনর্বিবেচনা করতে হবে যা শুধু প্রতিরোধমূলক নয় বরং সুস্থতার দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রহণযোগ্য, যেমন আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান দ্বারা আলোকিত ব্যবস্থায় দেখা যায়।

স্বাস্থ্য সম্পর্কে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি :

আমাদের ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্যব্যবস্থা সুষম-খাদ্যাভ্যাস, বিনোদন, ব্যায়াম, যোগ ও ধ্যানের সমন্বয়ে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে যা স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সহায়ক হয় এবং শরীরকে সংক্রমণ প্রতিরোধী হতে শক্তিশালী করে। আমাদের ঐতিহ্যগত জীবনশৈলী সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আমাদের মধ্যে দৈবী গুণের বিকাশ ঘটায়। কোভিড সংকটের সময়ে জনসমাগম, বিয়ের উৎসব এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন নিষিদ্ধ ছিল। এইসব অনুষ্ঠানগুলিকে সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে সম্পন্ন করতে হতো। যদিও এইসব অনুষ্ঠানে সাধারণত যেরকম উদ্দীপনা বা উৎসাহ দেখা যায় তা সংকুচিত হয়েছিল কিন্তু এর ফলে যে সম্পদ এবং শক্তি সংরক্ষিত হচ্ছিল তার সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রভাব আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তা হলো স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে অপচয়মূলক ব্যয় এবং বাহুল্য এড়িয়ে প্রকৃতি-অনুকূল জীবন যাপন করার চেষ্টাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একটি যথার্থ প্রকৃতিবান্ধব জীবনযাত্রার পক্ষে আন্দোলন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। সঙ্ঘ স্বয়ংসেবকরাও পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মানুষকে জল সংরক্ষণ, নির্বিচারে প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করা এবং বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছে।

বর্তমানে, আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে, গ্রাম পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা কার্যকরভাবে মেটানো যেতে পারে। যদি আমরা ব্লকস্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যপরিষেবা সংগঠিত করার পরিকল্পনা করি তাহলে জেলা পর্যায়ে তৃতীয় স্তরের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং বড়ো শহরে সুপার স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষেবা ঠিক ভাবে পরিচালনা করা সম্ভব। একটি চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যের অপর আধিপত্যে বা দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠে, সমস্ত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলির যৌক্তিক ব্যবহার সকলের জন্য সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি :

প্রচলিত বিশ্ব-অর্থনীতির কাঠামো নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে

কম্পমান এবং এই অভূতপূর্ব অবস্থা অন্যান্য রষ্ট্রের ধরাছোঁয়ার বাইরে। অবাধ যান্ত্রিকীকরণ এবং ফলস্বরূপ বেকারত্ব বৃদ্ধি, অনৈতিক প্রযুক্তির কারণে মানবিক মূল্যবোধের অবনমন এবং দায়িত্বহীন ক্ষমতার উত্থান এর কিছু উদাহরণ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও বিকাশের নতুন দিশার প্রত্যাশায় সমগ্র বিশ্ব এখন ভারতের মুখাপেক্ষী। আমাদের স্ব-তন্ত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি মানব জীবনের বহু প্রাচীন অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী মন্থন করা অর্থনৈতিক গবেষণার সার বস্তুগুলিকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে বলা হয় সুখের উৎস মানুষের চেতনার মধ্যে নিহিত। বস্তুগত সামগ্রী সীমাহীন সুখের উৎস নয়। তেমনি প্রকৃত আনন্দ কেবল শারীরিক সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সভ্যতায় সেই অর্থনৈতিক মডেলকেই আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে— যা একসঙ্গে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে আত্মাকে সন্তোষ প্রদান করে; যা ব্যক্তি, সমষ্টি এবং প্রকৃতির একসঙ্গে সুষম বিকাশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ জ্ঞানের ঐশ্বরিক উৎসকে উপলব্ধি করার প্রক্রিয়াকে সহজ করে দেয়; যেখানে ধর্ম বা ন্যায় নীতির দ্বারা চালিত অগ্রগতি ও আনন্দ উপভোগ করে মানুষের আত্মা প্রকৃতি মুক্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। আমাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে— উপভোগ নয়, সংযম বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ শুধুমাত্র ভৌতিক সম্পদের দেখাশোনা করে, সেই সম্পদের একাধিকারী নয়। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে মানুষ এই সৃষ্টির একটি অংশমাত্র এবং প্রকৃতি তার জীবন ধারণের জন্য যে সম্পদ প্রদান করে তা ব্যবহার করা যেমন তার অধিকার তেমনি এই প্রকৃতিকে রক্ষা এবং সংরক্ষণ করাও তার দায়িত্ব। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিচ্ছিন্ন বা একতরফা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল পুঁজিপতি, বণিক, উৎপাদনকারী বা শ্রমিক— এমন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সর্বাধিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার কথা বলে না। প্রকৃতপক্ষে, এই পদ্ধতি সমস্ত মানুষের প্রয়োজন বিবেচনা করে এমনকী সমাজের প্রান্তিক মানুষটিকেও একটি বৃহৎ মানব পরিবারের সদস্য হিসাবে বিবেচনা করে যেখানে সবার জন্য পারস্পরিক বিনিময় ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে পরিতৃপ্তি নিশ্চিত করা হয়। আমাদের এখন প্রয়োজন— এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে একটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল তৈরি করা, বিশ্বব্যাপী সমাদৃত আমাদের জ্ঞানকে সুসংহত করা এবং আমাদের বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপটে এটিকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। স্বাধীনতার একটি স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে সামগ্রিক এবং সমন্বিত অগ্রগতির এমন একটি নতুন মডেলের প্রকাশকে গণ্য করা হয়। এটি বহু প্রতীক্ষিত 'স্ব' বা আত্মবোধের উন্মোচন।

জনসংখ্যা নীতি :

দেশের উন্নয়নের কথা আলোচনা করতে গেলেই একটি সমস্যা সামনে চলে আসে যা অনেকের কাছে উদ্বেগজনক বলে মনে হয়। দেশের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অদূর ভবিষ্যতে অনেক সমস্যার জন্ম দিতে পারে। অতএব, এই চ্যালেঞ্জটি যথাযথ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। ২০১৫ সালে রাঁচিতে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের সভায় এই বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল।

অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের প্রস্তাব : জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে ভারসাম্যহীনতার চ্যালেঞ্জ— দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপগুলি গত এক দশকে পর্যাপ্ত ফল দিয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে, অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল মতামত দিয়েছে যে ২০১১ সালের আদমশুমারির ধর্মীয় তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে গুরুতর জনসংখ্যাগত পরিবর্তন দেখানো হয়েছে তা জনসংখ্যা নীতি পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর বৃদ্ধির হারের ব্যাপক পার্থক্য, অনুপ্রবেশ এবং ধর্মান্তরকরণের ফলে জনসংখ্যার অনুপাতের ধর্মীয় ভারসাম্যহীনতা, বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। যদিও ভারত ১৯৫২ সালে বিশ্বের প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল যারা জনসংখ্যানীতি প্রণয়নের কথা ঘোষণা করেছিল, বাস্তবে ২০০০ সালে সর্বপ্রথম একটি বিস্তৃত জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয় এবং একটি জনসংখ্যা কমিশন গঠন করা হয়। এই নীতিতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ২০৪৫ সালের মধ্যে একটি স্থিতিশীল কিন্তু সুস্থ জনসংখ্যা অর্জনের লক্ষ্যে আদর্শ প্রজনন হারের (টিএফআর) ২.১-এ পৌঁছানোর লক্ষ্য অর্জন করা হবে। এটা আশা করা হয়েছিল— যেহেতু এই লক্ষ্যটি আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত সেজন্য এটি সমাজের সকল স্তরে সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে।

কিন্তু ২০০৫-০৬ সালের 'ন্যাশনাল ফারটিলিটি অ্যান্ড হেলথ্ সার্ভে' এবং ২০১১ সালের জনগণনায় ধর্মের ভিত্তিতে ০-৬ বছর বয়ঃক্রমের শিশুদের ধর্মের ভিত্তিতে শতকরা হিসাব এই দুই থেকে দেখা যাচ্ছে যে টিএফআর এবং শিশু সংখ্যার অনুপাত অসমান। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের ভূমি থেকে উদ্ভূত ধর্মের অনুসারী মানুষের সংখ্যা ৮৮ শতাংশ থেকে নেমে ৮৩.৮-এ পৌঁছেছে।

তাছাড়া, অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি, যা স্পষ্টতই বাংলাদেশ থেকে অবিরাম অনুপ্রবেশের ইঙ্গিত দেয়। সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত উপমন্যু হাজারিকা কমিশনের রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আদালতের পর্যবেক্ষণ এই সত্যগুলিকে নিশ্চিত করেছে। এটাও সত্য যে অনুপ্রবেশকারীরা এই রাজ্যগুলির নাগরিকদের অধিকার হরণ করছে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টির পাশাপাশি ইতিমধ্যেই যা কিছু স্বল্প সম্পদ তার উপর ভারী বোঝা হয়ে উঠছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার ধর্মীয় ভারসাম্যহীনতা গুরুতর আকার নিয়েছে। অরুণাচল প্রদেশে ১৯৫১ সালে ভারতের ভূমি থেকে উদ্ভূত ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ছিল ৯৯.২১ শতাংশ ছিল। ২০০১ সালে এটি ৮১.৩ শতাংশ এবং ২০১১ সালে ৬৭ শতাংশে নেমে আসে। মাত্র এক দশকে অরুণাচল প্রদেশের খ্রিস্টান জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। একইভাবে, মণিপুরের জনসংখ্যায়, ভারতের ভূমি থেকে উদ্ভূত ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা যা ১৯৫১ সালে ৮০ শতাংশের বেশি ছিল, ২০১১ সালে ৫০ শতাংশে নেমে এসেছে। এই উদাহরণগুলি এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির নির্দেশকগুলি থেকে বোঝা যায় দেশের বহু জেলায় কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দ্বারা ধর্মান্তরকরণের একটি সংগঠিত এবং উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপ

চলছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকারীমণ্ডল এই সমস্ত ভয়াবহ জনসংখ্যা সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতার জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়— দেশে সম্পদের সহজলভ্যতা, ভবিষ্যতের চাহিদা এবং জনসংখ্যা সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতার সমস্যাকে সামনে রেখে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সংস্কার করা হোক সবার জন্য তা একইভাবে প্রয়োগ করা হোক। সীমান্ত পার হয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হোক। নাগরিকদের একটি জাতীয় নিবন্ধন প্রস্তুত করে এই অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন এবং জমি ক্রয় করতে বাধা দেওয়া হোক। এবিকেএম সমস্ত স্বয়ংসেবক-সহ দেশবাসীকে এই জনসংখ্যার পরিবর্তনের কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানায় এবং জনসচেতনতা তৈরি করা এবং এই জনসংখ্যাগত ভারসাম্যহীনতা থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা নিজের জাতীয় কর্তব্য বলে মনে করে।

এই বিষয়গুলি সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নীতিগুলির সর্বব্যাপী এবং কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক জনসচেতনতা এবং নিরপেক্ষ পদক্ষেপের প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে, স্থানীয় হিন্দুদের নিপীড়নের খবর, ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলকতা এবং যে অঞ্চলে ভারসাম্যহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে সেখান থেকে পালানোর জন্য তাদের উপর চাপ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পর যে সহিংসতা শুরু হয়েছিল এবং সেখানকার হিন্দু জনগোষ্ঠীর করুণ অবস্থার জন্য সরকার কর্তৃক বর্বর অত্যাচারীদের তোষণ করা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতাকেও দায়ী করা যেতে পারে। অতএব, এমন একটি নীতির প্রয়োজন যা একই পদ্ধতিতে সমস্ত গোষ্ঠীর জন্য অপরিহার্য ভাবে প্রযোজ্য হবে। গোষ্ঠীস্বার্থ তোষণের জাল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সকলের সম্মিলিত ভাবে জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে বিবেচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে :

আরেকটি পরিস্থিতি, যা পুরোপুরি বিস্ময়কর ছিল না, কিন্তু প্রত্যাশিত সময়ের আগেই ঘটে গেল, তা হলো তালিবানদের আফগানিস্তান দখল। তাদের প্রবণতা— ইসলামের নামে প্রচণ্ড ধর্মান্ধতা, স্বৈরাচার ও সন্ত্রাসবাদ— সবাইকে তালিবান সম্পর্কে আতঙ্কিত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখন চীন, পাকিস্তান ও তুরস্ক তালিবানদের সঙ্গে অশুভ জোটে অংশগ্রহণ করেছে। আবদালির সময়ের পর আমাদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমানা আবারও গুরুতর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর এবং শান্তি আলোচনার মধ্যেই বারবার তালিবান শক্তি পরিবর্তিত হয়েছে। এটি একটি নির্দেশক যে আমরা এখন আর আত্মতৃপ্তিতে থাকতে পারি না। সীমান্তে আমাদের সামরিক প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা সম্পর্কে সরকার এবং সমাজকে সতর্ক থাকতে হবে এবং সতর্কতার সঙ্গে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টা করতে হবে, সাইবার নিরাপত্তার মতো নতুন ক্ষেত্রে ও সর্বশেষ কারিগরি দক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টা বাড়ানো উচিত। জাতীয় নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত। আলাপ-আলোচনার জন্য দরজা খোলা রাখা এবং হৃদয় পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য না করে, আমাদের অবশ্যই সকল সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কঠিন সময়ে, ভারতের বাকি অংশের মানুষের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের ভাবগত ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করছে। জম্মু ও কাশ্মীরের সন্ত্রাসীরা জাতীয়তাবাদী নাগরিকদের— বিশেষ করে হিন্দুদের লক্ষ্য করে হত্যালীলা আবার শুরু করেছে যাতে আমাদের মনোবল ধ্বংস করা যায় এবং উপত্যকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। নাগরিকরা সাহস নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড দমন ও নির্মূল করার প্রচেষ্টা দ্রুততর হওয়া দরকার।

হিন্দু মন্দির :

জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও শান্তির বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হুমকি ছাড়াও হিন্দু সমাজের নিজস্ব কিছু উদ্বেগ রয়েছে; এগুলোর সমাধানের প্রচেষ্টাও সমানভাবে জরুরি। হিন্দু মন্দিরগুলির অবস্থা আজ এমনই একটি উদ্বেগের বিষয়। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেশের বাকি অংশে কিছু সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিছু যৌথ পারিবারিক ট্রাস্টের মাধ্যমে এবং কিছু সমাজের নিবন্ধন আইনের অধীনে পরিচালিত ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত হয়। অল্প কিছু মন্দিরের পরিচালন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব রয়েছে। মন্দিরের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অপব্যবহারের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক নির্দেশিকা এবং নির্দেশক শাস্ত্রগুলি প্রতিটি মন্দির এবং তার মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবতার জন্য প্রযোজ্য। সেই আনুষ্ঠানিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের ঘটনাও ঘটছে। জাতপাত নির্বিশেষে সকল ভক্তের কাছে ভগবানের মন্দির দর্শন, উপাসনা করার বৈষম্যহীন সুযোগ সর্বত্র প্রচলিত নয়; এটা নিশ্চিত করা উচিত।

এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরগুলির ধর্মীয় আচরণবিধি সংক্রান্ত অনেক সিদ্ধান্ত পণ্ডিত বা আধ্যাত্মিক গুরুদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ ছাড়াই এবং হিন্দু সমাজের সংবেদনশীলতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতার সঙ্গে নেওয়া হয়। কয়েক দশক ধরে দেখা যাচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় স্থানগুলির পরিচালনার অধিকার অন্য ধর্মাবলম্বী বা ধর্মহীন, অনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই অবিচারগুলি অবশ্যই বাতিল করতে হবে। এটাও প্রয়োজনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত যে হিন্দু মন্দিরগুলির পরিচালনার অধিকার হিন্দু ভক্তদের হাতে তুলে দেওয়া এবং হিন্দু মন্দিরগুলির সম্পদ শুধুমাত্র দেবতার পূজা এবং হিন্দু সমাজের কল্যাণের জন্য যেন ব্যবহার করা হয়। এই ভাবনার পাশপাশি নতুন করে ভাবতে হবে— হিন্দু সমাজের শক্তির উপর ভিত্তি করে মন্দিরগুলির যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে এবং মন্দিরগুলিকে আবার আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে।

আমাদের ঐক্যের ভিত্তি :

সরকারি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রের লোকেরা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করে থাকেন, তা সত্ত্বেও জাতীয় বিষয়ে সমাজের উচিত সক্রিয় মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক অংশগ্রহণ। কিন্তু সমস্যা শুধুমাত্র

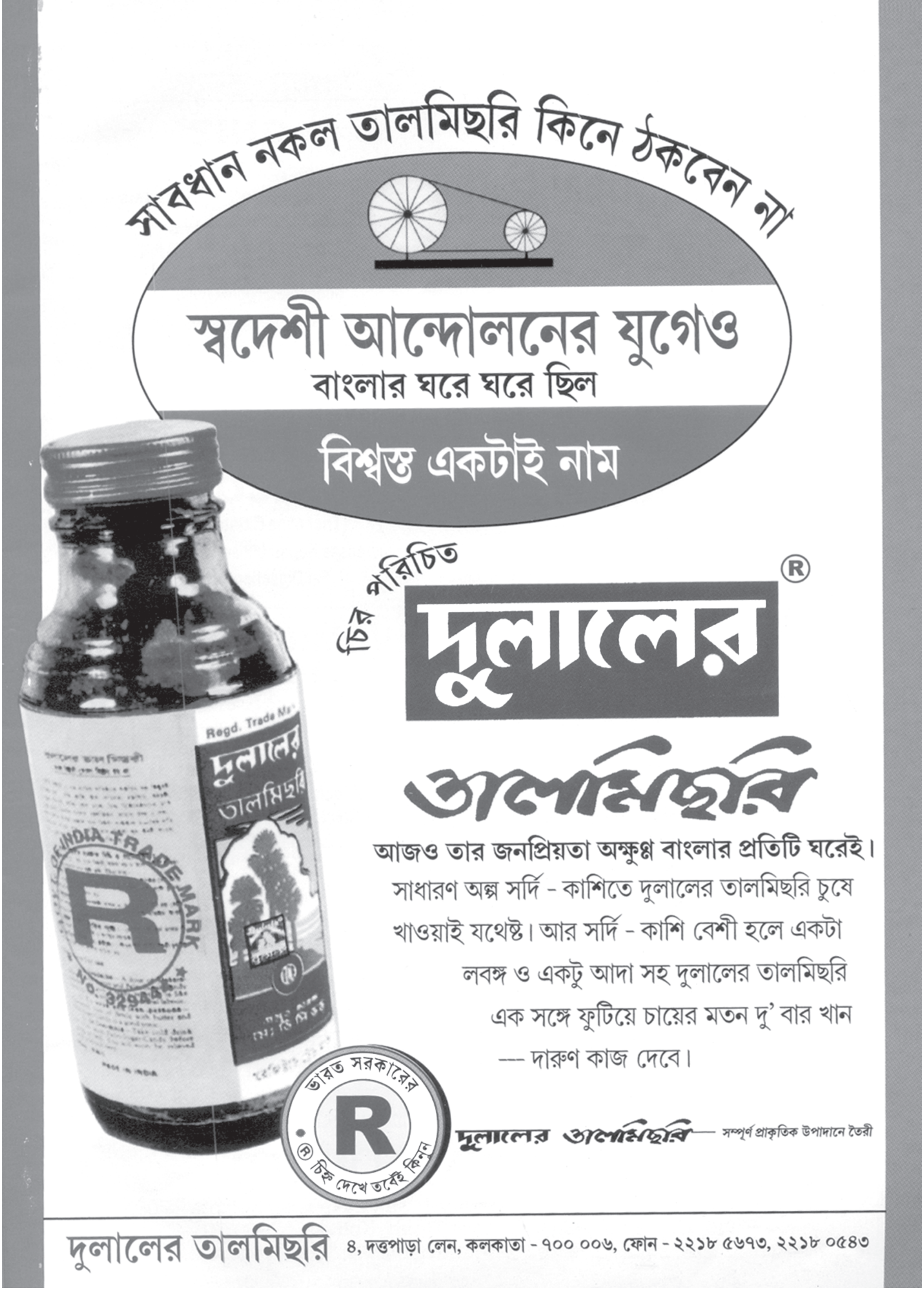

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের R ® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

সমাজের উদ্যোগেই সমাধান করা যেতে পারে। এই কারণে, উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি, সমাজের কর্মপদ্ধতি, চিন্তাভাবনা এবং অভিপ্রায়গুলিরও আচরণগত পরিবর্তন প্রয়োজন। অতএব, আবহমানকাল থেকে প্রবাহিত এই সনাতন রাষ্ট্রের চিরন্তন তত্ত্ব এবং জ্ঞান আমাদের সমাজের সম্মিলিত চেতনায় ভালোভাবে প্রবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। আমাদের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগত, ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক ঐতিহ্যকে একটি সূত্রে বেঁধে সকলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি করে। একই সঙ্গে বিকাশের অভিন্ন সুযোগের মধ্যে সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করাই আমাদের সংস্কৃতি। আমাদের আচার-আচরণ এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। আমাদের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বর্ণভিত্তিক, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক পরিচয় থেকে আমাদের মধ্যে যে অহংভাব তৈরি হয় তা আমাদের অবশ্যই ভেঙে দিতে হবে। সমস্ত ভারতবাসী, এমনকী সেই সব সম্প্রদায়ের সদস্যদের যাদের ধর্মগুলি বাইরে থেকে আনীত হয়েছে, তাদেরও বুঝতে হবে যে আমাদের আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং উপাসনার পদ্ধতিগুলির পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা সবাই একটি উন্নত, চিরন্তন সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং গৌরবের উত্তরাধিকারী। এই অনন্য উত্তরাধিকারিতাই আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার ভিত্তি। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে উপাসনার পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।

এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে বিদেশি হানাদারদের সঙ্গে অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ও আমাদের দেশে এসেছিল। আজ আর সেইসব সম্প্রদায়ের অনুগামীরা অতীতের হানাদারদের সঙ্গে সম্পর্কিত নন বরং সেই হিন্দু পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যারা এই হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার জন্য সংগ্রাম করেছিল। আমাদের পূর্বপুরুষরাই আমাদের আদর্শ। এই সত্যের জন্যই এদেশ— হাসনখান মেওয়াতি, হাকিমখান সুরি, খুদবাকশ এবং গউস খানের মতো শহিদ এবং আশফাকুল্লাহ্ খানের মতো বিপ্লবী দেখেছিল। তারা আমাদের সকলের কাছে 'রোল মডেল'। যখন কেউ ধর্মীয় আগ্রাসন, আধিপত্যবাদী মনোভাব এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে উদ্ভূত বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে ভারত, তার সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি এবং তার বৃহত্তর হিন্দু সমাজ যা সকলকে গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে, একমাত্র তারাই মৌলবাদ, অসহিষ্ণুতা, সন্ত্রাসবাদ, দ্বন্দ্ব, শত্রুতা এবং শোষণের ধ্বংসাত্মক দখল থেকে বিশ্বের ত্রাণকর্তা হতে পারে।

সংগঠিত হিন্দু সমাজ :

যদি ঐতিহাসিকভবে আমাদের দেশে পারস্পরিক বিবাদ, অন্যায়, সহিংসতার প্রাদুর্ভাবের কিছু ঘটনা ঘটে থাকে, অথবা যদি বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্দেহ, বৈষম্য ও শত্রুতা দীর্ঘকাল ধরে বিরাজমান থাকে এবং যদি বর্তমান সময়েও এই ধরনের কিছু ঘটে থাকে, তাহলে সেই সমস্যাগুলির কারণ অনুধাবন করতে হবে এবং আলোচনা ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেই কারণগুলি উপড়ে ফেলে সেসব সমস্যার পুনরাবৃত্তি এড়ানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে শক্তি আমাদের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়, পারস্পরিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং আমাদের আস্থা কেন্দ্রগুলি ধ্বংস ও কলুষিত করে, তারা আমাদের পিছিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের মূলধারার মূল্যবোধ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে হিন্দু সমাজ তখনই এধরনের অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারবে যখন তার সংগঠিত সামাজিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং নির্ভীক চেতনা সকলে উপলব্ধি করতে পারবে। অতএব, যারা নিজেদের হিন্দু বলে দাবি করেন তাদের সকলের দায়িত্ব ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের আচরণের মধ্যে হিন্দু-দৃষ্টিভঙ্গির একটি উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করা। আমাদের সব ধরনের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে হবে। দুর্বলতা কাপুরুষতার জন্ম দেয়। আমাদের ব্যক্তিজীবনে শারীরিক ও বৌদ্ধিক শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও সহনশীলতা বৃদ্ধির উপায় নিয়ে অনুশীলন করতে হবে। একটি সমাজের শক্তি তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত; সম্মিলিত স্বার্থ সম্পর্কে অনুভব, প্রজ্ঞা এবং নিষ্ঠা এই প্রক্রিয়ার চাবিকাঠি। যে কোনো ধরনের দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকা এবং সেসব মতাদর্শ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে যারা বিচ্ছিন্নতাবোধকে উসকে দেয়। শক্তি একত্রীকরণের জন্য এই আবেদন প্রতিক্রিয়াশীল বা বিরুদ্ধভাবে হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। এটি সমাজের একটি স্বাভাবিক প্রত্যাশিত ব্যবস্থা। শুধুমাত্র জাতীয় চরিত্রের সমন্বয়ে, শক্তিশালী এবং সচেতন কোনো সমাজই বিশ্বের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে তার কথা বলতে পারে। সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও শক্তির প্রয়োজন। দৃঢ় এবং নির্ভীক হয়ে আমাদের এমন একটি হিন্দু সমাজ নির্মাণ করতে হবে যেখানে এই শব্দগুলির প্রতিফলন ঘটবে— 'আমি কাউকে হুমকি দিই না, আমি নিজেও ভয় কাকে বলে জানি না।' একটি সজাগ, ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী এবং সক্রিয় হিন্দু সমাজই সকল সমস্যার সমাধান।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বিগত ৯৬ বছর ধরে এই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যাবে। যে শুভ উৎসব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, তার বার্তাটিও একই। ন'দিনের জন্য ঈশ্বরে আস্থাশীল মানুষেরা কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে শক্তির আবাহন করেন এবং শক্তি সংহত করেন। এই সময়কালেই সেই অসুরকে বধ করা হয়েছিল যে বিভিন্ন ভাবে মানবিকতাকে জর্জরিত করে তুলেছিল। আজ, সমগ্র বিশ্ব বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতের কাছে অনেক প্রত্যাশা করে এবং ভারত যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা পূরণ করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। যে বৈচিত্র্য আমাদের সমাজকে একত্রে আবদ্ধ করে তা হলো আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবগাথা এবং মাতৃভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্যনিতব্য। 'হিন্দু' শব্দটি এই অনুসঙ্গের বহিঃপ্রকাশ। এই তিনটি উপাদানে সুস্নাত আমরা সকলেই আমাদের অন্তর্নিহিত সনাতন সংহতির স্বতন্ত্রতাকে আমাদের ভূষণ হিসেবে পরিধান করতে পারি এবং আমাদের দেশকে উন্নত করতে পারি। আমাদের এটা করতেই হবে। এটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্রত। এই মহান তপস্যায় সবাইকে নিজেদের অর্ঘ্য অর্পণের আহ্বান জানাচ্ছি।

(নাগপুরে বিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতজীর ভাষণ)

সমগ্র বরাকবাসীকে শুভ
দীপাবলী ও
ভাইফোঁটার আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
জানাই—

গোপাল কান্তি রায়

সম্পাদক,
বিজেপি কাছাড় জেলা
১ মাইকেল মধুসূদন সরণী,
শিলচর, কাছাড়, অসম
মোবাইল - ৯৮৫৪২৮৯৪২৬

With Best Compliments
From-

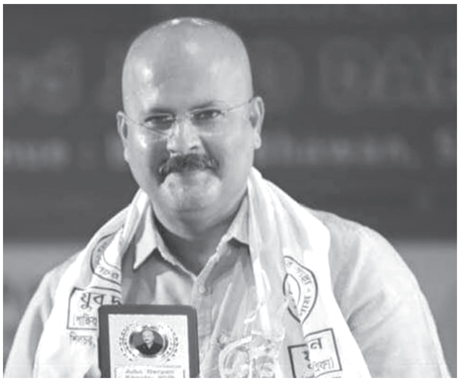

Vivek Poddar

Poddar JCB, Silchar
C/o Podder & Podder
(Equipment & Project) Pvt. Ltd.
Mob. - 9954086007

With Best Compliments
From-

Raimata Enterprises

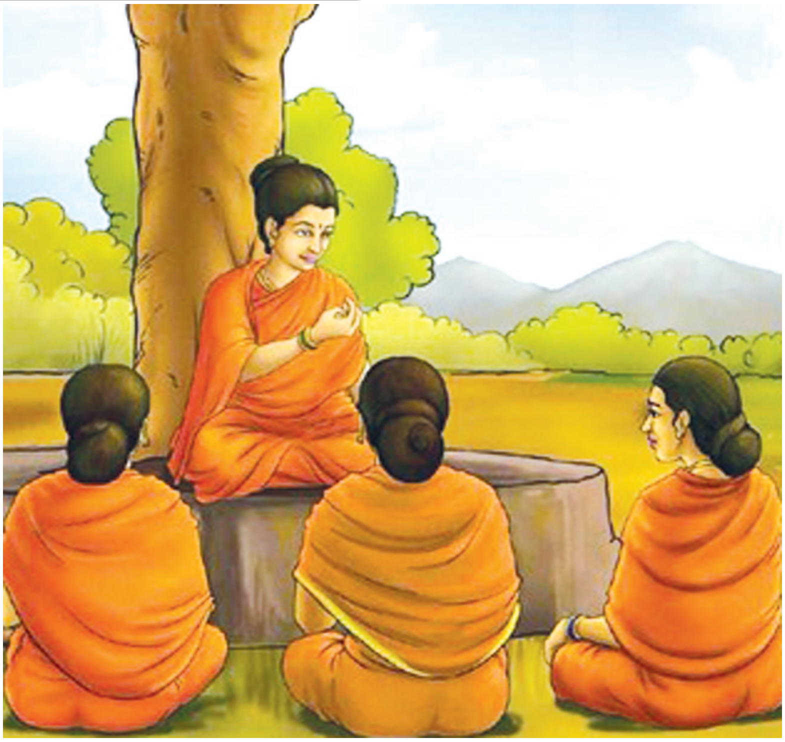

বৈদিক যুগে নারীজাতির অবস্থান

পুনম নেগী

নারীর ক্ষমতায়নের কথা উঠলেই সাধারণত মানুষের মনে হয় যেন গত কয়েক বছর থেকেই দেশে মহিলাদের অধিকারের জন্য আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। এরকম ভাবনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভারতের বৈদিক সাহিত্যের সমস্ত উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, ভারতীয় সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই মহিলাদের অবস্থান সম্মানজনক ও গৌরবময় স্থানে রয়েছে। দুঃখের বিষয় হলো, তালিবানি মানসিকতা সম্পন্ন হিন্দুদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থী বিচারধারার তথাকথিত ঐতিহাসিকদের এক বড়ো অংশ স্বাধীনতার পর থেকেই হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলির বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে হিন্দুধর্মে মহিলাদের শোষণ ও অপমানের এক মনগড়া ও তথ্যহীন কথা প্রচার করে সনাতন সংস্কৃতির গৌরবকে ধোঁয়াশাচ্ছন্ন করার ষড়যন্ত্রে মেতেছে।

রাম ও কৃষ্ণকে নিয়ে অনর্গল মিথ্যাচার :

এদের বড়ো অভিযোগ হলো, হিন্দুধর্মে যে রাম ও কৃষ্ণকে পূজা করা হয়, সেই রাম এক ধোপার কথায় নিজের গর্ভবতী স্ত্রীকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিয়েছে এবং কৃষ্ণ যার ১৬ হাজার পত্নী ছিল। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ প্রকৃতপক্ষে এদের কুৎসিত ভাবনা ও অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামের ওপর এই অভিযোগের স্পষ্ট উত্তর রয়েছে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৪২তম সর্গের ৩১ থেকে ৩৫ শ্লোকে। এখানে শ্রীরাম তাঁর গর্ভবতী পত্নী সীতাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে, এই অবস্থায় তোমার পরম ইচ্ছা কী? তখন সীতামাতা উত্তর দিচ্ছেন, হে রাঘব, এই সময়ে পবিত্র তপোবনে থেকে মহান মুনি-ঋষিদের সান্নিধ্যে থাকতে চাইছি। এর ফলে আমার গর্ভস্থ শিশু ক্ষাত্রতেজের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মতেজও লাভ করতে পারবে। শুনে শ্রীরাম বললেন— এরকমই হবে দেবী। আমি আগামীকালই তোমাকে তপোবনে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।' এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, সীতামাতা তাঁর ভাবী সন্তানের লালনপালনের জন্য স্বেচ্ছায় বনবাস স্বীকার করেছিলেন। শ্রীরাম তাঁকে নির্বাসিত করেননি।

এরকমই দ্বাপরযুগের মহান রাষ্ট্রনায়ক শ্রীকৃষ্ণের ১৬ হাজার পত্নীকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এদের নিকৃষ্ট বুদ্ধিরই পরিচায়ক। এরা যদি কখনো হিন্দু ধর্মগ্রন্থ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়তেন তাহলে জানতে পারতেন যে, তখনকার একজন শক্তিশালী ও কামান্ধ অত্যাচারী শাসক জরাসন্ধর জেলখানা থেকে ১৬ হাজার যুবতীকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করেন। এই লাঞ্ছিতা ও আশ্রয়হীনা রমণীদের সমাজে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের নিজের স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেন। নারী সম্মানের এত বড়ো উদাহরণ অন্য কোন ধর্মে দেখা যাবে না।

এই রকমই রামচরিত মানস ও মনুস্মৃতির কিছু প্রক্ষিপ্ত ও ক্ষেপক অংশকে ভিত্তি করে হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির গরিমাকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস এই ভারতবিরোধীরা অনবরত করে চলেছে। রামচরিত মানসের সুন্দর কাণ্ডের এক চৌপাই 'ঢোল, গঁওয়ার, সূত্র, পশু, নারী, সকল তাড়নাকে অধিকারী'-এর ভিত্তিতে গোস্বামী তুলসীদাসকে নারীবিরোধী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। প্রখ্যাত রামকথা বাচক প্রেমভূষণ মহারাজ বলেন, হিন্দুদ্বেষীরা ওই চৌপাইয়ের অর্থ বিকৃত করেছেন।

ফঃ ৬

চৌপাইটির শুদ্ধ অর্থ হলো— যে নারী সূর্পনখার মতো পশুবৎ আচরণ করে, সে তাড়না অর্থাৎ দণ্ডযোগ্য হয়ে থাকে। মা জগজ্জনীর চরণবন্দনাকারী গোস্বামী তুলসীদাস নারীজাতির বিষয়ে এরূপ অনুচিত শব্দ প্রয়োগ করবেন এ চিন্তারও অতীত। আসলে ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন মতলববাজদের এটা একটা কৌশলমাত্র। সংস্কৃত, ব্যাকরণ, সাংখ্য, ন্যায় ও বেদান্তের প্রখর বিদ্বান তথা চিত্রকুটের তুলসীদাস ধামের পীঠাধীশ্বর রামভদ্রাচার্যের মতও এই প্রকার। তাঁর মতে আজকাল বাজারের কিছু কিছু রামচরিত মানসের অশুদ্ধ ব্যাখ্যা এরকম বিতর্কে ইন্ধন জোগাচ্ছে। এরকম অশুদ্ধ ব্যাখ্যা যত শীঘ্র দূর করা যায় তার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। তিনি বলেন, চৌপাইটির শুদ্ধ রূপ হলো— 'ঢোল গঁওয়ার, ক্ষুব্ধ পশু, রারী'। অর্থাৎ 'বেসুরা ঢোলক, অনাবশ্যক ও আবোলতাবোল বলা মূর্খ, যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো রাগী পশু এবং কলহপ্রিয় লোক দণ্ডযোগ্য হয়ে থাকে।' ধর্মগ্রন্থের বিকৃত প্রসঙ্গ এবং ভুল ব্যাখ্যা করে যারা হিন্দু সমাজকে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করছেন তারা কখনও সফল হবে না।

পুত্রেণ দুহিতা সমা :

প্রাচীন হিন্দুসমাজ মহিলাদের অবস্থান নিয়ে ভারত বিরোধীরা এরকমই প্রলাপ বকেন মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে। এদের মধ্যে কেউ হয়তো মূল মনুস্মৃতি পড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তবু তারা হিন্দুদের গালি দিতে একটুও শ্রান্ত হন না। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে গ্রন্থে 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে, রমন্তে যত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যতে সর্বাস্তত্রহফলাঃ ক্রিয়াঃ।।' (মনুস্মৃতি ৩/৫৬) বলে নারীকে দেবীরূপে সম্মান জানানো হয়, সেখানে কীভাবে নারীকে অপমান, শোষণ ও দোহন করার কথা বলা হবে? হিন্দু জীবন পদ্ধতির এই আদর্শ আচার সংহিতায় মনু স্পষ্ট লিখেছেন, যে বংশে নারীরা নিজের স্বামী অথবা পরিজনদের দ্বারা অত্যাচারে জর্জরিত হয়, সেই বংশ শীঘ্র নষ্ট হয়ে যায় (মনুস্মৃতি ৩/৫৭)। হিন্দুধর্মে স্ত্রীজাতির অতি সম্মানজনক অবস্থানের এরকম বহু উল্লেখ মনুস্মৃতিতে রয়েছে। পুত্র-কন্যা এক সমান— লোকেরা মনে করে এই স্লোগান বর্তমান সময়ে শুরু হয়েছে, কিন্তু মনু মহারাজ বৈদিককালে 'পুত্রেণ দুহিতা সমা' (মনুস্মৃতি ৯/১৩০) বলে পুত্র-কন্যার সাম্য ঘোষণা করেছেন। তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র-কনার সমান অধিকারের কথা বলেছেন, তা মনুস্মৃতির ৯/১৩০ থেকে ৯/১৯২ ভাগে বর্ণিত রয়েছে। উল্লেখ্যনীয় যে, মনুস্মতিতে কন্যাকে 'দুহিতা (দু+হিতা)' অর্থাৎ পিতা ও পতি দুই কুলের হিতসাধনকারিণী বলে মহিমামণ্ডিত করা হয়েছে, সেখানে হিন্দু বিরোধীরা দুহিতা শব্দের বিকৃত অর্থ 'দোহনযোগ্য' করেছেন। এ থেকেই এদের অল্পবুদ্ধির অনুমান করা যায়। হিন্দু সমাজ নারীর সমানতার পক্ষপাতী মনু স্ত্রীজাতির জীবনে সমস্ত প্রকার ছোটো-বড়ো সমস্যার প্রতি খেয়াল রেখে তা নিরাকরণের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। মনুস্মৃতির ৮/৩২৩, ৯/২৩২ ও ৮/৩৪৩-শ্লোকে স্ত্রীজাতির প্রতি সংঘটিত অপরাধ যেমন হত্যা, অপহরণ, বলাৎকার ইত্যাদির জন্য মৃত্যু দণ্ড ও নির্বাসনের মতো কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মনু স্ত্রীজাতির সুরক্ষাহীনতা ও মর্যাদাহীন স্বাধীনতার পক্ষপাতী নন। এজন্য তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে লিখেছেন যে, তাঁরা নিজেকে পিতা, পতি, পুত্রাদির সুরক্ষা থেকে স্বতন্ত্র যেন না করেন (৫/১৪৯, ৯/৫-৬)। এর পিছনে মহর্ষি মনুর মূল উদ্দেশ্য ছিল, নারীর সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করা নয়।

মায়ের নামে পরিচয় :

স্ত্রীজাতির পারিবারিক অধিকারের কথা বলা হলে দেখা যাবে, তৎকালীন সমাজে নারীর ক্ষমতা ও স্বনির্ভরতা এত উচ্চ ও সম্মানজনক ছিল যে সন্তানদের তাদের মায়ের পরিচয়ে জানা যেত। যেমন, কৌশল্যানন্দন, সুমিত্রানন্দন, দেবকীনন্দন, গান্ধারীনন্দন, কৌন্তেয় ইত্যাদি। এরকমই পত্নীর নাম পতির আগে ব্যবহার হতো— লক্ষ্মীনারায়ণ, গৌরীশঙ্কর, সীতারাম, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি। অন্য কোনও ধর্মসংস্কৃতিতে নারীজাতিকে সম্মান দেওয়ার এরকম উদাহরণ পাওয়া যাবে? এর কোনও উত্তর তথাকথিত ভারতবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের কাছে নেই।

বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রীশিক্ষা :

ভারতীয় নারীর সম্মান যজুর্বেদের ২১/৫ শ্লোকে দেখা যাবে—

মহীংমূষু মাতরং সুব্রতানামৃতস্য পত্নীমবসে হুবেম।

তুবিক্ষত্রামজরন্তীমুরূচী সুশর্মাণমদিতিং সুপ্রণীতিম্।।

অর্থাৎ 'হে নারী! তুমি মহাশক্তিময়ী। তুমি সুব্রতী সন্তানের মাতা। তুমি সত্যশীল পতির পত্নী। তুমি পরিপূর্ণ ক্ষাত্রবল সম্পন্না। তুমি ঘোর সংকটের সময় ভেঙে না পড়ে অতিশয় কর্মশীলা। তুমি কল্যাণকারী ও শুভনীতি অনুসরণকারিণী।' এই শ্লোক তো একটি নমুনামাত্র। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য স্ত্রীশক্তির মহিমাগানে ভরপুর। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, কন্যাকেও ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক পূর্ণরূপে বিদুষী হয়েই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করতে হবে (অর্থবেদ ১১/৫/১৮)। মাতা-পিতা তাঁদের কন্যাকে পতিগৃহে পাঠানোর সময় তাকে জ্ঞান ও বিদ্যা উপহার দেবেন (অথর্ববেদ ১৫/১/৬।।)। স্ত্রী তার শিক্ষা ও শুভগুণে পতিগৃহের সবাইকে প্রসন্ন রাখবে (১৪/১/২০।।)। পতি তার নববধূকে বলবে--- তুমি সাংসারিক সমস্ত কলায় অভিজ্ঞ, তুমি আমাদের বংশের ধন, সমৃদ্ধি ও মান বৃদ্ধি করবে (অথর্ববেদ ৭/৪৭/২।।)। নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়ে বেদ বলছে— শুধু রাজাই নয়, রানিও ন্যায়বিচার করতে পারেন (যজুর্বেদ ১০/২৬।।)। বৈদিক ঋষি নারীদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন (যজুর্বেদ ১৬/৪৫।।)।

বৈদিক সাহিত্যের সমস্ত উল্লেখ প্রমাণ করে যে, সেই যুগে বালকদের মতো বালিকাদেরও উপনয়ন সংস্কার হতো। বালিকারাও গুরুগৃহে (আশ্রম) থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করে বিদ্যালাভ করত। ক্ষত্রিয়কুলের নারীরা ধনুর্বেদ অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যারও শিক্ষা গ্রহণ করত। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে

যে, শ্রীরামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠের গুরুকুলে সংগীত ও পরিবেশ সংরক্ষণের শিক্ষা তাঁর শ্রেষ্ঠ বিদুষী স্ত্রী অরুন্ধতী দিতেন।

স্ত্রীশিক্ষার দুইরূপ---সদ্যোবধূ ও ব্রহ্মচারিণী :

হারীত সংহিতায় উল্লেখ রয়েছে, বৈদিককালে স্ত্রীশিক্ষা দুটি ভাগে হয়ে থাকত— (১) সদ্যোবধূ (যারা বিবাহের আগে থেকে শিক্ষাগ্রহণ করছে) এবং (২) ব্রহ্মবাদিনী (যারা ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক সারা জীবন শিক্ষাগ্রহণকারিণী)। সদ্যোবধূ অর্থাৎ সদ্য বিবাহিতা কন্যারা সেই সময় শিক্ষা গ্রহণ করত যাতে তারা সুগৃহিণী হতে পারে। বেদ অধ্যয়ন ছাড়াও তাদের সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, শিল্প ও শস্ত্রবিদ্যা-সহ মোট ৬৪ কলার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। লক্ষণীয় যে, উপনিষদকালীন ওই ব্রহ্মবাদিনীরা আজ হিন্দুসমাজের বিদ্বৎসমাজের কাছে আলোকস্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাভরে পূজিত হচ্ছেন। ঋক্‌বেদে গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, গোধা, বিশ্ববারা, অপালা, অদিতি, ইন্দ্রাণী, লোপামুদ্রা, সার্পরাজ্ঞী, বাক, শ্রদ্ধা, মেধা, সূর্যা ও সাবিত্রীর মতো বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা বহু বিদুষীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করতেন সমগ্র ঋষিসমাজ। এদের প্রচণ্ড মেধাশক্তির পরিচয় দেয় বেদের বিভিন্ন সূক্ত। ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা-আত্রেয়ী ঋক্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮তম সূক্ত, ঘোষা-কাক্ষীবতী দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত, সূর্যাসাবিত্রী দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূক্ত, অপালা-আত্রেয়ী অষ্টম মণ্ডলের ৯১তম সূক্ত, শচী-পৌলমী দশম মণ্ডলের ১৪৯তম সূক্ত এবং লোপামুদ্রা প্রথম মণ্ডলের ১৭৯তম সূক্ত রচনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মের চিন্তন-মননের সঙ্গে এই ব্রহ্মবাদিনীদের শিক্ষিকারা খুব কুশলতার সঙ্গে দায়িত্ব নির্বাহ করতেন। অশ্বালায়নের গৃহসূত্রে গার্গী মৈত্রেয়ী বাচক্নবী, সুলভা, বড়বা, প্রাতিথেয়ী প্রমুখ শিক্ষিকার নাম পাওয়া যায় যাঁদের উপধ্যক্ষা সম্বোধন করা হয়েছে। যে বামপন্থীরা প্রাচীন ভারতে নারীসমাজকে অশিক্ষিত রাখার মিথ্যা-প্রচার করেন, তাঁদের নিজের চোখের মিথ্যার

মাতৃশক্তির এরকম উদাহরণ বিশ্বে দ্বিতীয় নেই

মহাসতী অনসূয়া সম্পূর্ণ ভারত ইতিহাসে এক মহান নারী চরিত্র। তিনি তাঁর মহা তপোশক্তিবলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে দুগ্ধপোষ্য শিশুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই কাহিনি হিন্দুধর্মের প্রতিটি মানুষ ভালোভাবেই জানেন। আরও এক মহা তপস্বিনী নারী চরিত্র হলেন সাবিত্রী। প্রচণ্ড তপোবল ও বুদ্ধি কৌশলে নিজের স্বামীকে যমরাজের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন। এই ঘটনার স্মৃতিতে আজও হিন্দু সধবা রমণীরা বট-সাবিত্রী ব্রত পালন করেন। আদিশক্তি মা পার্বতী তাঁর দুর্ধর্ষ তপোবলে কামদহনকারী আদিযোগী শিবকে স্বামী রূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পত্নী সুকন্যার প্রচণ্ড সাধনাশক্তিতে অতিবৃদ্ধ স্বামী চ্যবনমুনি পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বিদেহরাজের শাস্ত্রসভায় তৎকালীন সর্বোচ্চ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে ব্রহ্মবাদিনী বিদুষী গার্গী তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই ঘটনা নারীশিক্ষার এক অপূর্ব উদাহরণ। শঙ্করাচার্য ও মণ্ডন মিশ্রের তর্কসভার বিচারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন মণ্ডন মিশ্রের ধর্মপত্নী উভয় ভারতী। হিন্দুধর্ম ছাড়া নারীজাতির এমন গৌরবশালী ভূমিকা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

আবরণ খুলে রেখে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, বৈদিককালের মহিলারা যদি দর্শন, তর্ক, মীমাংসা, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের পণ্ডিত না হতেন তবে তাঁরা এত বিপুল পরিমাণ বৈদিক সাহিত্য রচনা করতে পারতেন? মহাভারতে কাশকৃৎস্না নামে এক বিদুষীর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি মীমাংসা দর্শনের ওপর কাশকৃৎস্নী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এরকমই অষ্টম শতাব্দীতে পাওয়া গেছে রুসা নামের এক লেখিকা যার রচনায় ধাতুকর্মের অনেক বিবরণ রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য তাঁর কন্যা লীলাবতীকে গণিত বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য লীলাবতী গ্রন্থ রচনা করেন। ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে নাগ শাসকদের তাম্রফলকে মাসকদেবী নামে এক বিদুষী রাজকুমারীর উল্লেখ রয়েছে যিনি কৃষকদের হিতার্থে রাজ্যের নিয়ম পরিবর্তন করেছিলেন। এইরকমই পৃথ্বীরাজ রাসোমহাকাব্যে উল্লেখ রয়েছে কনৌজ রাজকন্যা সংযুক্তা মদনা নাম্নী এক আচার্যা পরিচালিত কন্যাগুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে বিভিন্ন রাজ্যের ৫০০ রাজকুমারীও তাঁর সঙ্গে পড়াশোনা করতেন। দুঃখের বিষয় হলো, স্ত্রীশিক্ষার এমন গৌরবজনক স্বর্ণিম অধ্যায় পাঠান-মোঘল শাসনকালে এবং পরে ব্রিটিশ শাসনকালে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। ভারতীয় সমাজে যেভাবে জোরকদমে তথাকথিত অত্যাধুনিকতা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধানুকরণের নামে সিনেমা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে নারীকে ভোগ্যারূপে দেখানো হচ্ছে; ক্রমবর্ধমান যৌন অপরাধ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এগুলিকে বন্ধ করার জন্য নারীশরীর প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন, টিভি সিরিয়াল ও এই জাতীয় চলচ্চিত্রের ওপর প্রতিবন্ধকতা জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনও আবশ্যক। শিশুমনে মাতৃজাতির প্রতি সম্মানজনক ভাবনার প্রতিফলনের জন্য আমাদের আবার বেদমুখী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

এক সাহসী সেবাময়ী নারী শ্রীমতী মুনমুন সরকার

বিমলকৃষ্ণ দাস

ভাদ্রের মাঝামাঝি। মেঘলা আকাশ রাতের অন্ধকারকে আরও যেন গাঢ় করে তুলেছে। আর মাঝে মাঝে এক-আধ পশলা বৃষ্টি ধুইয়ে দিতে চাইছে সেই অন্ধকারকে। রাত হয়েছে, তবু নজর করলে দেখা যেত এরই মধ্যে পাড়ার বড়ো রাস্তায় গাছের নীচে একটি ছোট্ট তিন চাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে। বোধহয় কেউ সামনের সিটে পা তুলে বসে আছে তার মধ্যে। কোনো আগন্তুক বা উৎসুক ব্যক্তি যদি একটু জোর গলায় জিজ্ঞেস করত— 'এই, এটা কার টোটো, এখানে কেন?' তাহলে দেখা যেত তৎক্ষণাৎ আপাদমস্তক প্লাস্টিকে মোড়া একজন মাথা বের করে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিচ্ছেন— 'এ টোটো নয়, এটা কোভিড অ্যাম্বুলেন্স। এর মধ্যে প্রতিদিন আট দশজন কোভিড রোগী হাসপাতালে যাতায়াত করে, প্রয়োজনে কারও মৃতদেহও নিয়ে যায় শ্মশানে।' স্তম্ভিত হতেন আগন্তুক। না শুধু স্তম্ভিত নয় একটা বিদ্যুৎ স্পন্দনের অনুভূতি হতো নারীকণ্ঠে দৃপ্তস্বরে এই কথাগুলি শুনে।

উপরের বার্তালাপগুলি হয়তো কিছুটা কল্পিত। কিন্তু ঘটনা ততোধিক সত্য। গত বছর (২০২০) কোভিডের তখন ভরা মরশুম, আগস্ট কী সেপ্টেম্বর হবে, শিলিগুড়ি শক্তিগড়ের রাস্তায় এমন এক সেবাময়ী নারীকে শুধুমাত্র পিপিই কিট্স পরে তিনদিন তিনরাত রাস্তায় টোটোর মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। পাড়ার লোক, বাড়িওয়ালা তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। তাঁর অপরাধ— যখন কোভিড আতঙ্কে পরিত্রাহী অবস্থা শহর জুড়ে, আশেপাশে নানাদিক থেকে নিত্য আসছে মৃত্যুর খবর। করোনার খবর পেলে তার ধারে কাছে পর্যন্ত যখন কেউ পৌঁছতে চাইতো না, অ্যাম্বুলেন্স দুষ্প্রাপ্য, পেলেও আকাশছোঁয়া দাবি— তখন যেন স্বতঃ সেবাধর্মে দীক্ষিত এক নারী নিজের সংসার নির্বাহের ব্যবহৃত টোটোটিকে নিঃশুল্ক কোভিড অ্যাম্বুলেন্সে পরিণত করলেন। হাসপাতালে যাতায়াতের

দিন-রাত কোনও সময় ছিল না। খবর শুনেই সবাই ওকে অচ্ছুত করে দিল। শুরু হলো, নিন্দা, সমালোচনা, খবরদারি। কেউ পাশে আসেনি, না আশেপাশের মানুষ, না প্রশাসন। শুধু তার স্বামী দূর থেকে খাবার দিয়ে যেতেন। তিনদিন এভাবে পিপিই কিট্স পরে থেকে তাঁর গায়ে ফোস্কা তৈরি হলো। একসময় শারীরিক কষ্ট, মানসিক আঘাতে অনেকটা পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবু দমেননি। থেমে যায়নি আর্ত পীড়িতের জন্য তার এই সেবা বাহনটি। গত ৫ সেপ্টেম্বর সারদা শিশুতীর্থ সূর্যসেন কলোনিতে শিক্ষকদিবস তথা পূর্ব ভারতে বিদ্যাভারতীর প্রথম বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সেবা-প্রতিজ্ঞ এই নারী শ্রীমতী মুনমুন সরকারকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে সম্মানিত করা হয়। মানুষকে ভালোবাসার প্রতিদানে একসময় তাঁর প্রতি অবজ্ঞা অপমান ঘৃণা ও নির্যাতনের যে বর্ণনা সেদিন তিনি শুনিয়েছেন তা ছিল যেমন বেদনার,

ক্যাপশন

তেমনি স্তম্ভিত করার মতো।

মানুষের প্রতি ভালোবাসার এই নিদর্শন তৈরির আগে তাঁকে দেখা যেত পশুপ্রেমী হিসেবে। ১৯৯৮ সালে তিনি প্রতিদিন প্রায় ৬০-৭০টি পথের কুকুরকে খাবার দিতেন। তাতেও প্রচুর সমালোচনা— আদিখ্যেতা, লোকদেখানো, বেশি-বেশি, কুকুর কামড়ালে দেখে নেব ইত্যাদি শ্লেষাত্মক বাক্য। তখন থেকেই কোনো রোগীকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, সমস্যায় পড়লে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। শুধু বাইরে নয় পরিবারেও ছিল তাঁর এই দৃঢ় চরিত্রের প্রভাব। প্রতিষ্ঠিত তিনভাই থাকা সত্ত্বেও অসুস্থ মাকে তিনি নিজের কাছে রেখে সেবা সুশ্রূষা করেন। শুধু তাই নয়, মায়ের মৃত্যুর পরে মুখাগ্নি করেন তিনি নিজে।

পরিবারের আর্থিক অনটন দূর করতে ২০১২ সালে একটি টোটো কেনেন মুনমুনদেবী। উত্তরবঙ্গে তিনিই ছিলেন প্রথম টোটোচালিকা। তাঁর কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে শিলিগুড়িতেই ১৭৮ জন মহিলা টোটো চালানোর মধ্যে জীবিকা খুঁজে নেন। কিন্তু এখানেও স্বস্তি ছিল না, মহিলা বলে নানা কটূক্তি, নোংরা ভাষার ব্যবহার, গাড়ি ভাঙচুর এমনকী পুলিশের গালিগালাজ পর্যন্ত। এই প্রমীলাবাহিনীর টোটোতে চেপে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক মানুষগুলিকে পূজায় প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করেছেন তিনি প্রতি বছরের জন্য। রাখিবন্ধনের দিন সব টোটো দিদিদের রাখিবন্ধন শিলিগুড়ির রাস্তায় এক নতুন দৃশ্য তৈরি করল। এর জন্য যাবতীয় খরচ কিন্তু মুনমুনদেবীই করতেন। তারপর ২০২০। যাত্রীবাহী টোটো পরিণত হলো করোনা রোগীর নিঃশুল্ক অ্যাম্বুলেন্স। দিনরাত রোগী নিয়ে থাকা। তিনি নিজে বলেছেন— 'কখনও যে ভয় হতো না তা না', কিন্তু অদ্ভুত বিষয় হলো, ১২ বার তিনি কোভিড টেস্ট করালেও কখনও পজেটিভ আসেনি। আজ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার করোনা রোগী তিনি বহন করেছেন। এসব নিয়ে যারা নিরন্তর সমালোচনা অবজ্ঞা কটূক্তি করতেন তাদের চেহারা হঠাৎ সেদিন পালটে গেল— যেদিন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁকে টুইট করে শুভেচ্ছাবার্তা জানান (১০ সেপ্টেম্বর ২০২০)। বাড়িতে তখন লোকেলোকারণ্য। শুভাকাঙ্ক্ষী, শুভার্থী, সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফারের ভিড়ে ছয়লাপ। হায় রে মানুষ! আজ মুনমুনদেবীকে কত সংবর্ধনা, কত চ্যানেলে নিমন্ত্রণ, কত প্রশংসা, কত পরিচয়। এই বিশাল কর্মসাধনার সঙ্গে তিনি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করে থাকেন। আজ পর্যন্ত এরকম প্রায় ১০০টি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তিনি করেছেন। তাছাড়া যেখানে এরকম ক্যাম্প হয় সেখানে রক্তদাতা নিয়ে গিয়ে ডোনেশন কার্ড সংগ্রহ করেন— পরবর্তীতে যার প্রয়োজন তাকে সহযোগিতার জন্য। কিন্তু যে অর্থ সংস্থানের জন্য তাঁর এই টোটো তাতে এখন অনেকেই উঠতে চায় না করোনার ভয়ে। আয় কমে গিয়ে এক চতুর্থাংশ হয়ে গেছে, তবে সেবাকাজ চলছে পুরো উদ্যোমে। সামনে অনেক নতুন পরিকল্পনা। এমন সেবাময়ী প্রমীলাবাহিনী নিয়ে একটি বৃদ্ধ-সেবাশ্রম তৈরি তার মধ্যে অন্যতম।

মুনমুনদেবীর স্বামী আনন্দ সরকার সামান্য ঠিকাদার ব্যবসায়ী। এক কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে এবং এক ছেলে-বউমা দুজনেই সরকারি চাকুরে। কিন্তু দুঃখের বিষয়— এমন মানের ছেলে বউমা তার কাছে থাকে না, তারা পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে— মা টোটো চালায় যে! কখনও রাস্তায় দেখা হলেও কথা বলে না। আশা করব তাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন একদিন অবশ্যই হবে। আমরা শিলিগুড়িবাসী কিন্তু এই সেবাময়ী মায়ের জন্য গর্বিত। ঈশ্বরের কাছে তাঁর সফল ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম। ☐

দীপাবলী ও ছট পূজা উপলক্ষে সমগ্র কাছাড়বাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

অমিয় কান্তি দাশ

সাধারণ সম্পাদক,
ভারতীয় জনতা পার্টি, কাছাড় জেলা
মোবাইল নং ৯৪৩৫১৭৭৪৯৬,
৮৬৩৮২৩৯৪০৭

সমগ্র বরাকবাসীকে শুভ দীপাবলী, ভাইফোঁটা ও ছটপূজার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই—

দিপায়ন চক্রবর্তী

বিধায়ক,
শিলচর বিধানসভা
মোবাইল -৯৪৩৫০৭৩৪৪৩

প্রচারবিমুখ এক সমাজসেবী

ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ

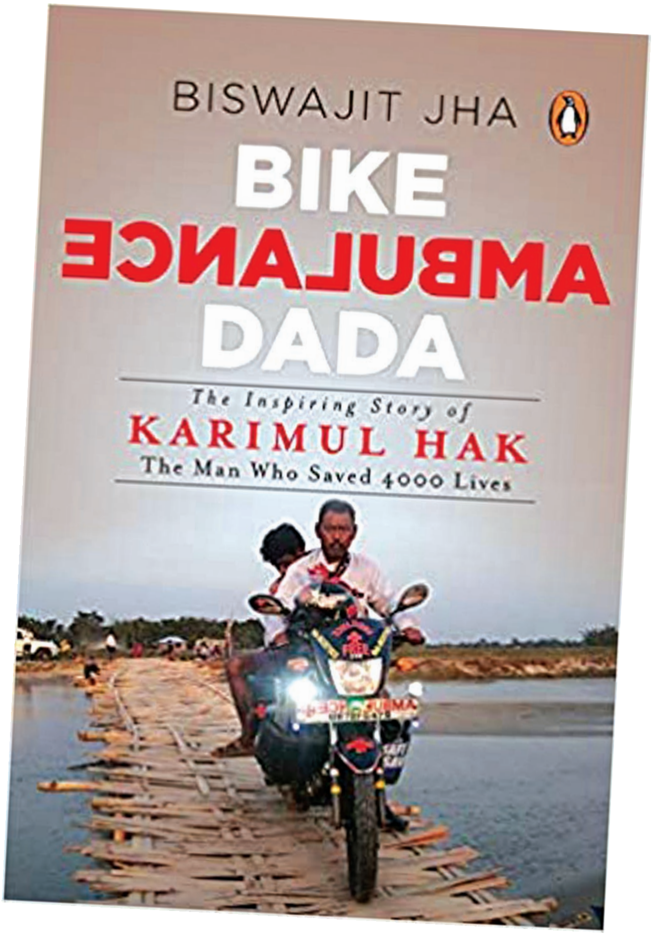

মলাটে নামটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 'Bike Ambulance Dada, The inspiring story of Karimul Hak' সঙ্গে ছবি— রুগি নিয়ে বাইক-চালক করিমুল হক। মলাটের পশ্চাৎ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে করিমুল অ্যাম্বুলেন্স। ২০৭ পাতার ইংরেজি ভাষায় লেখা পেঙ্গুইন প্রকাশনার এই বইটি মোট আঠাশটি অধ্যায় নিয়ে মনটানা ঘটনার মধ্য দিয়ে একটি সত্য লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার পাণ্ডববর্জিত করে রাখা অবহেলিত রাজডাঙার ধলাগড়ির চা বাগানে বেড়ে ওঠা অখ্যাত এক চা-কর্মী জীবনের শুরু থেকে গত পঁচিশ বছর ধরে পদ্মশ্রী করিমুলবাবু হয়ে ওঠার জীবন্ত গল্প সত্যিই পড়তে আকর্ষণ করে।

করিমুল হকের জীবন কাহিনি এক প্রচার বিমুখ কিন্তু যথেষ্ট সফল উদ্যোগী একজন মানুষের যিনি প্রমাণ করেছেন ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, অন্য বাধা বিপত্তি সব নগণ্য হয়ে যায়। পাতায় পাতায় তার নজির দেওয়া আছে। বইয়ের লেখক প্রাক্তন সাংবাদিক এবং বর্তমানের সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ ঝা-কে এইরকম এক অনুপ্রাণিত ব্যক্তির জীবন আলেখ্য রচনার জন্য ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। কিন্তু বইটি শুধু ইংরেজি ভাষায় কেন, আফশোস এড়াতে পারলাম না। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে একইসঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাণীর উল্লেখ করা আছে যার মধ্যে ভারতীয় হিসেবে শুধু বিবেকানন্দ, আম্বেদকর ও গান্ধীজীদের স্থান দেওয়া হয়েছে, সনাতন ভারতবর্ষের মহামানবের তীর্থক্ষেত্র আর কোনোও অবতার, ঋষি ও ব্যক্তির বাণী না থাকায় লেখকের ভারতীয় সংস্কৃতিতে গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে।

করিমুলবাবু একজন সৎ মানবপ্রেমী ভারতমাতার সন্তান। বইয়ের ধারাবিবরণী থেকে করিমুলবাবুর জীবন আদর্শে মানবধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম— এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। সমাজের স্তরবিন্যাস, শিক্ষা, অর্থ ও সমস্তরকমের বাধাবিঘ্ন অদমনীয় করিমুলবাবুকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নজির আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। করিমুলবাবু স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসেন। তার এই স্বপ্ন সমাজের কল্যাণের জন্য এবং তার এই উদ্যোগে প্রশাসনের স্বীকৃতি ও সহযোগিতা ঘটে যাওয়ায় তাঁর চিন্তনের ব্যাপ্তিটা জানা গেল। স্বেচ্ছা স্বাস্থ্যকর্মী থেকে সমাজের বাকি অবহেলিত জায়গাগুলোতে কখনও তার নজর এড়িয়ে যায়নি যেটা তার পরবর্তী কর্মপরিধির ক্ষেত্র চয়ন থেকে জানা যায়। শিক্ষা, বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনের উপলব্ধি ও উদ্যোগের জন্য করিমুলবাবুকে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ হতে হয়নি।

তাছাড়া কর্মসংস্থান ও অর্থনীতির উত্থানে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে মোদী সরকারের আত্মনির্ভর ভারত গড়ার কর্মসূচিরই আশ্চর্যরকম প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল। সরকারের কৃষিবিলের প্রাসঙ্গিকতাও তারমধ্যে পাওয়া গেল। প্রচার বিমুখ এই ব্যক্তিটি প্রশংসা চান না, শুধু তাঁর স্বপ্নগুলির বাস্তবায়ন ঘটুক— এই আকুতি লক্ষ্য করা যায়। হতাশায় ভুগতে থাকা প্রতিটি মানুষের বইটি অবশ্যই পড়া উচিত। ভেতরে ছবিগুলি প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ। ভারতের সব ভাষায় বই পাওয়া গেলে উত্তম হবে।

পুস্তকের নাম : বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা। প্রকাশক : ইন্ডিয়া পেঙ্গুইন। লেখক : বিশ্বজিৎ ঝা। পৃষ্ঠা-২২৪। মূল্য : ২৫০ টাকা।

With Best Compliments
From-

Protex Industrial Products Pvt. Ltd.

With Best Compliments
From-

Mackfall Engineers

With Best Compliments
From-

ANITA ENGINEERS PVT. LTD.

With Best Compliments
From-

Ganesh Packaging